সূচী

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির একটি তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখা যায়। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার প্রভাব ও একটি নূতন জীবন সচেতনার অভ্যুদয় এই নবজাগরণের মূল। মধ্যযুগের কাব্যে, সংস্কৃত সাহিত্যের যে প্রকাশভঙ্গি ও রচনা পদ্ধতি প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল তাহার স্থলে এখন ইংরাজ সাহিত্যচর্চার অনুপ্রেরণায় ভারতীয় কাব্যে নব নব গবেষণার সূত্রপাত হয়। মানব জীবনের প্রকাশ সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় স্পষ্ট ও বাস্তবধর্মী হইয়া উঠে। মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তনে পুস্তক জগতে বিপ্লবের সূচনা হইল। গদ্য সাহিত্য, বিশেষতঃ গল্প ও উপন্যাস, পদ্য অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিল।

এই নবজাগরণের যুগে যে ওড়িয়া গদ্যসাহিত্য ও উপন্যাসের উদ্ভব হয় ফকীরমোহন সেনাপতি তাহার জন্মদাতা বলিয়া গণ্য হন। তিনি ১৮৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে বালেশ্বর সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে তাঁহার বয়স ছিল চৌদ্দ বৎসর। গদ্য সাহিত্যে তাঁহার অবদান প্রধানতঃ চারিটি উপন্যাস, কতকগুলি ছোট গল্প, এবং এক অতুলনীয় আত্মজীবনী। এই আত্মজীবনীতে তিনি প্রশাসক কর্মচারী হিসাবে পরিচালনাকৌশল, দুঃসাহসিক অভিযান ও আদিবাসী-বিদ্রোহ দমনের সফল প্রচেষ্টার বর্ণনা দিয়াছেন।

'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ' ফকীরমোহনের অনুপম কীর্তি। পরিণত বয়সে, পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে, তিনি এই উপন্যাসটি রচনা করেন। তাহার বিশ বৎসর পরে তিনি দেহত্যাগ করেন। সামান্য ইংরাজী জ্ঞান সত্ত্বেও তিনি ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশাসনিক কর্ম পরিচালনা করিয়া জনসাধারণের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ' তাঁহার বিচিত্র মূল্যবান্ ও ঘটনাবহুল অভিজ্ঞতার ফল।

এই কাহিনীর পরিকল্পনা, ইহার ভাষা, ও চরিত্রসৃষ্টি যেন স্থানীয় মৃত্তিকার অন্তর্নিহিত রসধারায় পরিপুষ্ট। শেখ দিলদার মেদিনীপুরের বৃহৎ ভূম্যধিকারী ছিলেন ও ওড়িশায় তাঁহার ভূসম্পত্তি ছিল। রামচন্দ্র মঙ্গরাজ এই সম্পত্তির পরিচালক নায়েব ছিলেন। তিনি একদিকে প্রজাদিগের নিকট হইতে কঠোরভাবে খাজনা আদায় করিতেন ও অন্যদিকে তাঁহার প্রভু দিলদারকে এই বলিয়া প্রতারণা করিতেন যে ফসল ভাল না

হওয়ায় প্রজারা খাজনা দিতে পারিতেছে না। এইরূপে তিনি অধিকাংশ অর্থই আত্মসাৎ করিতেন। দিলদার কখনও তাঁহার নায়েবের কথার সত্যাসত্য যাচাই করিবার হাঙ্গামা করিতেন না। কারণ তিনি ছিলেন মদ্যপ। সর্বদা মত্ত অবস্থায় থাকিতে পারিলে আর কিছু চাহিতেন না। তাঁহারই জমিদারীর খাজনা না জানিয়া তিনি রামচন্দ্র মঙ্গরাজের নিকট কর্জ করিতেন। এইরূপে বিশ্বাসঘাতক মঙ্গরাজ প্রভুর নির্বুদ্ধিতার সুযোগ লইয়া আপন তহবিল বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এবং অবশেষে একদিন মঙ্গরাজ দিলদারের মত্ত অবস্থায় ত্রিশ হাজার টাকার ঋণ কবালায় স্বাক্ষর যোগাড় করিল। অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ দিলদার মিঞার সমগ্র ভূসম্পত্তি কাছারীর নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল এবং রামচন্দ্র মঙ্গরাজই তাহা ক্রয় করিয়া এক বৃহৎ ভূসম্পত্তির ক্ষমতাশালী মালিক হইয়া বসিল।

মঙ্গরাজের নিবাসস্থল সেই গোবিন্দপুর গ্রামে এক তন্তুবায় দম্পতি ভগিআ ও তাহার পত্নী শারিআ বাস করিত। তাহাদের কয়েক বিঘা উৎকৃষ্ট ফলন্ত জমি ছিল (ইহা হইতেই বইখানির 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ' যাহার আক্ষরিক অর্থ. ছয় একর বত্রিশ ডেসিমেল)। মঙ্গরাজের লুব্ধ দৃষ্টি এই উৎকৃষ্ট ভূমিখণ্ডের উপর পড়িল এবং সে এটি আত্মসাৎ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। নিঃসন্তান ভগিআ ও শারিআর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কেহ নাই উপলব্ধি করিয়া ধূর্ত মঙ্গরাজ তাহাদের দুর্বলতার সুযোগ লইল ও সেই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজারীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আপন দুষ্কর্মের সহচরী চম্পা নামে এক কুখ্যাত রমণীকে ভগিআ ও শারিআর নিকট পাঠাইল।

চম্পা গিয়া সেই নির্বোধ তন্তুবায় দম্পতিকে সহজেই বুঝাইয়া দিল যে গ্রামদেবী তাঁহার পূজারীর মারফত আদেশ করিয়াছেন যে তাঁহার পূজা দিলে তিনি তাহাদিগকে পুত্র সন্তান দিবেন। তাহারা অবিলম্বে ইহাতে সম্মত হইল। দেবীর অধিষ্ঠান পীঠের ঠিক নীচে গোপনে একটি বৃহৎ গর্ত খোঁড়ান হইল এবং মঙ্গরাজের এক অনুচর তাহার ভিতর লুকাইয়া রহিল। পূজা দিবার পর ভগিআ ও শারিআ যখন বর প্রার্থনা করিল তখন গর্তের ভিতর হইতে লোকটি বলিয়া উঠিল, 'আমার দেউল তুলিয়া দে তোদের অনেক টাকা কড়ি ও সোনা দিব, তিনটি পুত্রও দিব। আমার আদেশ অমান্য করিলে ভগিআকে মারিয়া ফেলিব।'

চম্পার পরামর্শ অনুযায়ী ভগিআ মন্দির তোলাইবার জন্য তাহার একমাত্র জমিটুকু বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ করিবার জন্য মঙ্গরাজের স্বারস্থ

হইল। পরিশেষে সেই জমি মঙ্গরাজের হাতে চলিয়া গেল। ঋণের সুদ বাবদ তাহাদের একমাত্র গাভীটিও মঙ্গরাজ গ্রাস করিল। নিদারুণ দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যে হতভাগ্য ভগিআ উন্মাদ হইয়া কয়েদখানায় আবদ্ধ হইয়া রহিল। তাহার অভাগিনী পত্নী চরম অভাবের মধ্যে মঙ্গরাজের পত্নীর নিকট ভিক্ষা লইয়া কোনও মতে কিছুদিন জীবিত থাকিয়া অবশেষে দুঃখে ও হতাশায় প্রাণত্যাগ করিল। মঙ্গরাজ তাহার অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদ বেশীদিন ভোগ করিতে পারে নাই। গ্রামের চৌকিদার পুলিসকে সংবাদ দেয় যে মঙ্গরাজই ভগিআর স্ত্রীকে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। মঙ্গরাজ গ্রেফতার হইল কিন্তু প্রমাণাভাবে কেবল ভগিআর গরু চুরির দায়ে তাহার ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

জেলের কয়েকজন কয়েদী মঙ্গরাজের প্রতি আক্রোশ পোষণ করিত কারণ তাহাদের দুর্দশার জন্য মঙ্গরাজ দায়ী ছিল। এখন মঙ্গরাজ তাহাদের ন্যায় কয়েদী হওয়ায় তাহারা তাহাকে গালিগালাজ ও প্রহার করিবার কোন সুযোগই ছাড়িত না। তাহার পূর্ব দুষ্কর্মের সহযোগী চম্পা ও তাহার ব্যক্তিগত ভৃত্য গোবিন্দ গৃহে রক্ষিত সমুদয় অর্থ ও স্বর্ণ লইয়া পলায়ন করে। পথে লুণ্ঠিত ধনের ভাগ বাটোয়ারা লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে গোবিন্দ চম্পাকে সুবিধামত নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করে ও পরে ধরা পড়িবার ভয়ে নদীগর্ভে ডুবিয়া মরে।

অন্যদিকে কয়েদখানায় মঙ্গরাজের জীবন বড় শোচনীয় হইয়া উঠে। কয়েদীরা যখন তখন তাহাকে প্রহার করিত এবং উন্মাদ ভগিআ তাহার নাক কামড়াইয়া লয়। প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থায় সে কয়েদখানা হইতে খালাস পাইল। ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল তাহার গৃহ শূন্য ও পরিত্যক্ত। মৃত্যুশয্যায় অনুতপ্ত অবস্থায় সে তাহার অবহেলার ফলে বহুদিন যাবৎ মৃত তার ধর্মপরায়ণা পত্নীকে স্বপ্নে দেখিল। অন্তিমকালে পত্নীর স্মৃতির মধ্যে মঙ্গরাজ শান্তি ও সান্ত্বনা পাইতে চাহিল।

'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ' পুস্তকটি কথ্য ভাষায় লিখিত হালকা হাস্যরসের ধারায় জীবন ও সমাজের প্রতি সবল ব্যঙ্গোক্তিমিশ্রিত কশাঘাতের নিদর্শন। উপন্যাসাকারে ইহা এক গভীর জীবনদর্শন অথচ সাধারণ জীবনের রঙ্গরসের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আলোচিত সমস্যাগুলি আধুনিক সমাজে কোন না কোন আকারে বর্তমান। ইহাতেই গ্রন্থের সারবত্তা ও দূরদৃষ্টি প্রতিপন্ন হয়। যদি ওড়িয়া জীবনের একটি পরিপূর্ণ বাস্তব আলেখ্য অংকন করা সম্ভব হয় তবে 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ'-এর একটি চরিত্রও তাহা হইতে বাদ দেওয়া বা তৎস্থলে অন্য চরিত্র বসানো

যাইতে পারে না। মঙ্গরাজ, চম্পা ও গোবিন্দের ন্যায় দুরাত্মারা এবং মঙ্গরাজের পত্নী, ভগিআ ও শারিআর ন্যায় নিষ্পাপ, ধার্মিক, সজ্জন সকলেই সেই একই শোচনীয় দুর্ভাগ্যের কবলিত হইয়াছে। মৃত্যুশয্যায় মঙ্গরাজের তীব্র অনুতাপ ও আত্ম-দূষণের চিত্রন বিবেকহীন হত্যাকারীর হৃদয়েও পরিবর্তন আনা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বিশ্বাসের ইঙ্গিত দেয়। প্রত্যেকটি ঘটনা ও চরিত্র স্বাভাবিক ও জীবন্ত; এবং হাস্যরস ও ব্যঙ্গকৌতুক গভীর দুঃখাত্মক কাহিনীকে সহনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

নির্ভুল চরিত্রচিত্রণ, বাস্তবের অনুসরণে অঙ্কিত জীবনের প্রতিকৃতি এবং গ্রন্থকারের অননুকরণীয় শৈলী 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ'কে সাহিত্য জগতে কীর্তিস্তম্ভ করিয়াছে। গল্পের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও আলোচিত সমস্যাগুলি কালক্রমে তাহাদের গুরুত্ব হারাইতে পারে কিন্তু মানব-চরিত্রের মূল অবস্থা ও অন্তর্নিহিত মূল্য চিরকাল বজায় থাকিবে এবং ওড়িয়া সাহিত্যের এক অপূর্ব কীর্তি হিসাবে এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠতাও অম্লান থাকিবে।

১॥ রামচন্দ্র মঙ্গরাজ

রামচন্দ্র মঙ্গরাজ মফস্বলের জমিদার এবং মহাজন—নগদ টাকার কারবার অপেক্ষা ধানের মহাজনিই বেশী। শুনা যায় আড়ে-দীর্ঘে গ্রামের চারি ক্রোশের মধ্যে আর কাহারও কারবার চলে না। লোকটি বড় ধার্মিক। বৎসরে ২৪টা একাদশী, কিন্তু ৪০টা হইলেও একটিও যে বাদ যাইত এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। একাদশীর দিন তুলসীপাতার জল মাত্র অবলম্বন। এই সেদিন বিকালে মঙ্গরাজের জগা নাপিত এ-কথা সে-কথায় বলিয়া ফেলিয়াছিল প্রতি একাদশীর দিন সন্ধ্যাবেলা দ্বাদশীর পারণের জন্য কর্তাবাবুর শুইবার ঘরে সের খানিক দুধ, কিছু খই, লবাত ও পাকাকলা রাখা থাকে। জগা দ্বাদশীর দিন ভোরে খামকা বাসন মাজে। একথা শুনিয়া জনকয়েক মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া মুচকিয়া হাসিয়াছিল। একজন বলিয়া ফেলিল, 'ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাইলে শিবের বাবাও টের পায় না।' এ কথার অর্থ স্পষ্ট বুঝা গেল না, তবে আমরা অনুমান করিয়া লইলাম ইহা নিন্দুকের কথা। সে কথা থাক, বরঞ্চ আমরা কর্তাবাবুর সপক্ষে ওকালতি করিতে পারি। দুগ্ধভাণ্ড শূন্য হইবার ব্যাপারটা যে মঙ্গরাজ মহাশয়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার চাক্ষুষ সাক্ষী কই? শোনা কথা বা অনুমানকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে আমরা নিতান্ত নারাজ। আদালতের হাকিমদের তো এই মত। আর একটা কথাঃ বিজ্ঞানশাস্ত্র বলে যে জলীয় পদার্থ সকল বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। দুধ তো জলীয় পদার্থ, জমিদার বাড়ির দুধ বলিয়া বিজ্ঞান বাতিল করিবে নাকি! আবার সে ঘরে ইঁদুর, ছুঁচা ইত্যাদি ছিল, ছারপোকা মশা মাছিই বা কার ঘরে না থাকে? পেটের ধান্দায় জগতের সকল প্রাণী ঘুরিতেছে। তায় আবার তাহারা মঙ্গরাজের ন্যায় হরিবিলাস গ্রন্থমাহাত্ম্য শোনে নাই। এরূপ অবস্থায় মঙ্গরাজের ধর্মনিষ্ঠার প্রতি সন্দেহ করা মহাপাপ বলিয়া মনে করি। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী ঘটনাবলীর দিকে নজর রাখিবার জন্য প্রমাণ-আইনে বিচারক-দের প্রতি বিশেষ নির্দেশ আছে। মঙ্গরাজ মহাশয় সিদ্ধচাল স্পর্শ করেন না—শুটকী মাছের কথা ছাড়িয়া দাও। দ্বাদশীর দিন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তাহার পরে পারণ করেন। মঙ্গরাজ বড় হুঁশিয়ার লোক। এই ব্রাহ্মণভোজনরূপ মহৎকার্যে পাছে কখনও কোনও বিঘ্ন

ঘটে এই জন্য একজন কৈবর্তকে একমাণ* ও একজন ময়রাকে একমাণ এইরূপ দুইমাণ জমি ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। দ্বাদশীর দিন ভোরে কৈবর্ত দুই নউতি† চিড়া ও ময়রা কুড়ি পল‡ গুড় যোগান দিয়া যায়। গোবিন্দপুর শাসনের ২৭ ঘর ব্রাহ্মণ সকলে নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যেই ব্রাহ্মণভোজন হইয়া যায়। মঙ্গরাজ স্বয়ং ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেশন করেন। সকলের পাতে একবার চিড়া-গুড় দিয়া মঙ্গরাজ মহাশয় হাত জোড় করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলেন, 'গোঁসাইরা, বলুন আর কিছু প্রয়োজন কিনা. ঢের জলপান ঢের গুড় আছে; কিন্তু আমি জানি আপনাদের চোখ বড়, পেট ছোট, আপনাদের পেটে আর জায়গা নাই।' ইহার পরেও কোন হ্যাংলা ব্রাহ্মণ জলপান চাহিয়া বসিলে কর্তাবাবু তিনটি আঙ্গুলে পাঁচ-সাত গণ্ডা চিড়া লইয়া পাতে ফেলিয়া দেন। তারপরে গোঁসাইগণ 'পূর্ণ হইল, পূর্ণ হইল' বলিয়া লম্বা লম্বা ঢেকুর তুলিয়া আশীর্বাদ করিয়া পাত ছাড়িয়া উঠেন। ব্রাহ্মণভোজনের পরে যে এক নউতি চিড়া ও অর্দ্ধেক আন্দাজ গুড় উদ্বৃত্ত হয় তাহা ভক্তিপূর্বক মঙ্গরাজ সেবা করেন। পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিবেন, 'এক নউতি চিড়ায় সাতাশজন ব্রাহ্মণের পেট কিরূপে পুরিল?' হরি বোল ভাই হরি বোল! এ সকল কথার উত্তর দিতে গেলে আমাদের আর লেখা আগাইবে না। যীশুখ্রীষ্ট দুইখানি রুটিতে বার শ লোক খাওয়াইয়াছিলেন, আবার চারি ধামা বাড়তিও হইল। কাম্যক বনে শ্রীকৃষ্ণ দুর্বাসার বার হাজার শিষ্যের পেট একটুখানি শাকে ভরাইয়া দিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের হস্ত-মহিমার প্রতি যদি আপনার বিশ্বাস না থাকে, তবে আমাদের মঙ্গরাজচরিত্র পড়িবার জন্য অনুরোধ করিতে সাহস করিব না। এরূপ শুনা গিয়াছে তাঁহার মাসতুত ভাই শ্যাম-অ মল্ল শহরে গিয়াছিলেন—পাপ ঢাকা থাকে না—তিনি কুসঙ্গে পড়িয়া পেঁয়াজ দেওয়া কপি খাইয়াছেন একথা কর্তাবাবুর নিকট অজানা রহিল না। আজ পর্যন্ত তাঁহার ধোপা নাপিত বন্ধ থাকিত কিন্তু মঙ্গরাজ মহাশয় খুব কম খরচে অর্থাৎ শ্যামের সীমানা দেওয়া দেড় বাটি§ পৈতৃক লাখেরাজ হইতে ১৫

* মাণ॥ জমির মাপ বিশেষ, মোটামুটি এক একর বা ৩ বিঘা ২/৩ কাঠা। ১৬ বিঘা=১ গুণ্ঠ (প্রায় ২২/৩ কাঠা) ২৫ গুণ্ঠ=১ মাণ (৩ বিঘা ২/৩ কাঠা) ২০ মাণ=১ বাটি (৬০ বিঘা ১০ কাঠা)।

† নউতি (অথবা গউনী)॥ ধান, চাল, মুড়ি ইত্যাদির মাপ বিশেষ। ৪ কালি=১ বিশ্বা; ১৬ বিশ্বা=১ গউনী বা নউতি; ৮০ গউনী=১ ভরণ।

‡ পল=চার তোলা।

§ ১ বাটি॥ জমির মাপ বিশেষ, কুড়ি মাণ।

মাণ জমি মাত্র নিয়া রেহাই দিলেন। মঙ্গরাজ একদিন শ্যামকে ডাকিয়া মুরুব্বিয়ানা করিয়া কহিলেন, 'দেখ্‌ শ্যাম-অ এবার থেকে সামলে চলিস্‌। আমি ছিলাম বলে আমার খাতিরে না পাঁচজন তোকে জাতে তুলে নিল, নইলে তুইতো একেবারে কেরেস্তান হয়ে যেতিস—তোর সাতপুরুষ অহি-নরকে পড়ত আর আমি বলেই না তোর জমি পাঁচ টাকা মাণ দরে নিলাম, আর কেউ দুই টাকাতেও ছুঁইত না। হাজার হোক, ভাইত, তোকে কি আর ফেলতে পারি? হোক্‌ বিপদ আপদ তখন আমি—সুদিনে কে কার। এই সেদিন ভীমা গয়লার ফৌজদারী মোকদ্দমায় তোকে সাক্ষী হতে বললাম, তুই ঘরে লুকিয়ে থাকলি, দেখা দিলি না।'

হায়, হায়, যে নিন্দুকেরা খ্রীষ্টকে ক্রুশে চড়াইল, সতী শিরোমণি সীতাকে বনে পাঠাইল, তাহাদের বংশধরেরা যে একাদশী পালনকারী, পরোপকারী মঙ্গরাজের অখ্যাতি রটনা করিবে ইহা আশ্চর্য নহে। নিন্দুকেরা যে কথা বলিয়া বেড়াইবে আমাদের নাচার হইয়া সে কথা বলিতে হইতেছে। তাহারা বলে মঙ্গরাজ চারি ক্রোশের মধ্যে কাহারও গোষ্পদ পরিমানও জমি রাখিলেন না। বাকি ছিল ভাই, এতদিনে একটা ছুতা মিলিল। শ্যাম পেঁয়াজ খাইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইল, মঙ্গরাজের বাড়ির মেয়েরা যে চম্পাকে হাটে পাঠান পেঁয়াজ কিনতে? কথাচ্ছলে আমরা মানিয়া নিলাম চম্পা পেঁয়াজ কিনিয়া আনিল। খাওয়া হয় তার প্রমাণ কই? পলাণ্ডু গুঞ্জনঞ্চৈব, মনুতে না হয় খাওয়া নিষিদ্ধ, কিনিলে পতিত হইবে এমন বিধান কোথায়? তবে কিনা ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েদের দোষাদোষ সমালোচনাকারী নিন্দুকদের কথার উত্তর দিতে আমরা সম্পূর্ণ নারাজ।

২॥ স্বনামপুরুষোধন্য

মঙ্গরাজ গরিবের ছেলে ছিলেন। শুনা যায় সাত বৎসর বয়সে তিনি অনাথ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। পয়সার অভাবে বাপের শ্রাদ্ধশান্তি হয় নাই। ঘরের চালে খড় পড়ে নাই বলিয়া দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়ে। ইঁহার বাল্যজীবন, বিদ্যাশিক্ষা, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ প্রভৃতি ঘটনা অতি বিচিত্র। জগতের কোনও বিখ্যাত লোকের জীবনচরিত অলৌকিক ঘটনা-শূন্য নহে। সে সকল কথা লিখিতে গেলে ঢের কাগজ কলম ঢের সময় আবশ্যক। কিন্তু মিতব্যয়িতা যে একটি মহৎ গুণ এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষাগুরু মঙ্গরাজ মহাশয়। অর্থনীতি সম্বন্ধে মহাপণ্ডিত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহার মর্ম আমরা এইরূপ বুঝিয়াছি। কাগজ বাজার হইতে কিনিয়া আনা সহজ, ব্যবহার করা বড় কঠিন। আমরা ঠিক ঠিক সব কথা লিখিয়া মঙ্গরাজী অর্থনীতির মর্যাদা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব। (মঙ্গরাজের জমিদারির নাম ফতেপুর সরষণ্ড সদর জমা পাঁচ হাজার, আটাইশ বাটি বাহেল লাখেরাজ, বাজেয়াপ্ত পনের বাটি সাতাশ মাণ। সাতাশ মাণ কেন? ইহার সাত মাণের সরিকদার জজ আদালতে আপিল দায়ের করা আছে। লোকে বলে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা সুদে খাটিতেছে। বড় লোকের কথাও বড় শোনায় আমরা অনুমান করি পনের হাজারের বেশী নহে। মিথ্যা কথা বলা আমাদের ধর্ম নহে। ইনকমট্যাক্সের পেয়াদার নিকট হইতে এ কথা শুনিয়া বলিতেছি। ধান মহাজনির কাগজ বিশ বৎসর হইল রফা হয় নাই। ইহার সঠিক হিসাব দিতে আমরা অক্ষম। গেল বৎসর সুনিয়াতে* ধানের গোমস্তা যে খতিয়ান দাখিল করিয়াছিল তাহাতে মাথটের হিসাব হইতে আমরা জানিয়াছি যে দুই হাজার সাত ভরণ পনের নউতে ছয় বিশ্বা দুই কাণি† ধান গোলায় মজুত আছে। ঘর পাঁচ মহল, তিন মহলে তিন পুত্র, এক মহলে কর্তাবাবু মাঠাকরুণ ও ছোট মেয়ে মালতী থাকেন, বাহির মহলে কাছারি। কাছারি বাড়িটি বেশ বড় আটচালা, তাহার দেওয়ালের মাথায় আড়া কাঠের গায় বাঘ, হাতী, বেড়াল, রাধাকৃষ্ণ, বানর

* সুনিয়া॥ ওড়িশায় জমিদারী বৎসরারম্ভ ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী।

† ধান ইত্যাদির মাপ। ৪ কাণি=১ বিশ্বা। ১৬ বিশ্বা=১ গউনী বা নউতি। ৮০ গউনী=১ ভরণ।

খোদাই করা আছে। চারিদিকের দেওয়ালে শ্বেত, নীল, রক্ত, হরিৎ, পাটল বিবিধ রঙে পদ্ম কহ্লার, কুমুদ, মালতী, পুষ্পমালা, বানরযূথ রাক্ষসশ্রেণী সম্বলিত রামরাবণের যুদ্ধ প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনা সকল অঙ্কিত রহিয়াছে।

রাজপুতানার কোনও স্থানে একটি উলঙ্গ স্ত্রী মূর্তি দেখিয়া টড্ সাহেব অনুমান করিয়াছেন পূর্বকালে ভারতের অঙ্গনাগণ উলঙ্গ ছিলেন। হা কপাল! আমরা মঙ্গরাজের দেওয়ালের চিত্র দেখাইয়া সাহেবের মূর্খতা দূর করিতে পারিলাম না। দেওয়ালের গায়ে আঁকা সখীমণ্ডলী পরিবেষ্টিত রাধিকার গেরুয়ারঙের উপর হাঁড়ির কালির বুটিদার ঘাগরা দেখিলে অবশ্য সাহেবের মূর্খতা ও ভ্রান্তি বিদূরিত হইত। এই সমস্ত চিত্র আঁকিবার জন্য বাহির হইতে চিত্রকর আনাইবার আবশ্যক হয় নাই। সমস্ত কাজ চম্পার স্বহস্ত সম্পাদিত। চম্পা এত রকম পশুর ছবি আঁকিতে পারে যে তেমন পশু কলিকাতার চিড়িয়াখানায় তুমি খুঁজিয়া পাইবে না।

মঙ্গরাজের বাড়ির লাগাও পিছনে একটি বড় বাগান, খিড়কির দুয়ারের কাছে বড় এক পুকুর, পুকুরের চারিদিকে নারিকেল গাছ, তার পিছনে আম, কলা, কাঁঠাল, চালতার বাগান। বাগানের চারিপাশে সোনা-খাই বাঁশঝাড়ের বেড়া প্রাচীরের মত বেড়িয়া রহিয়াছে। মঙ্গ-রাজের ন্যায় নিঃস্বার্থ লোক সংসারে অল্পই দেখা যায়। তাঁর সব কাজ পরোপকারের জন্য। কর্তাবাবুর এই বড় বাগানটি গোবিন্দপুর হাটের স্থিতি ও উন্নতির মূলাধার। বাগানের নারিকেল, কলা, বেগুন, কুমড়া, খাড়া হইতে কাঁচা লঙ্কা পর্যন্ত হাটে না গেলে হাটের এত নাম ডাক শুনিত না। কর্তাবাবুর বাগানের আনাজ বেচা শেষ না হইলে আর কাহারও বেচিবার অধিকার নাই। সে তো ঠিক কথা! ভাল জিনিস-গুলা পড়িয়া থাকিবে, খারাপ জিনিস আগে বিক্রয় হইবে ইহা তো উচিত নহে।

হাট যে নিজের জমিদারির মধ্যে, অন্য লোকের জমিদারিতে হইলে অন্য কথা। সুনিয়া ও পালপার্বণে যে সকল কুমড়া বেগুন কলা ভেট আসে সে সকল সিধা হাটে চলিয়া যায়। চীনদেশের প্রাচীর তৈয়ারী হইবার পর সম্রাট দেশের সমস্ত ইতিহাস লেখকদিগকে ধরিয়া আনিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিলেন; কারণ প্রাচীরে কত টাকা খরচ হইল পাছে তাহারা লিখিয়া ফেলে। ইহাতে আমরা সম্রাটকে নিরহঙ্কারী পুরুষ বলিয়া থাকি। মহৎ লোকেরা মহৎ কার্য সাধন করিয়া তাহাতে কত টাকা খরচ

হইল বলিয়া বেড়ান না। মঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা কর, আপনার ইমারত করিতে কত টাকা লাগিল? উত্তর: 'বহু টাকা বহু টাকা, আমিতো ওতেই ফতুর হয়ে গেলাম।' পাঠক নিরাশ হইবেন না, অধীর হইবেন না।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্যাবলে সকল পুরাতন কথার হদিস পাওয়া যায়। নয় শত বৎসর পরে একজন সাহেব আসিয়া পুরীর মন্দির তৈয়ারীতে কত টাকা খরচ হইয়াছিল তাহা হিসাব করিয়া তালিকা দেখাইয়া দিলেন। মঙ্গরাজের নটেশাক বিক্রির হিসাব পর্যন্ত লেখা রহিয়াছে, বাড়ি তৈয়ারির খরচের কি হিসাব মিলিবে না? দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মাতৃশ্রাদ্ধের মত শ্রাদ্ধ ভারতবর্ষে কেহ করে নাই; করিবে না। বাংলার সমস্ত জেলার কলেক্টর সাহেব চাল, ডাল, ময়দা, তেল, ঘি, নারিকেল, কদলী কিনিয়া পাঠাইবেন বলিয়া বড়লাট সাহেব তাঁহাদের উপর হুকুম জারী করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের রাজা শিবচন্দ্রর সেইরূপ মাতৃশ্রাদ্ধ করিবার ইচ্ছা হওয়ায় খরচের ফর্দ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ কেবল গাঁজা, আফিম, তামাক-পাতার খরচের ফর্দ পাঠাইয়া দিয়া সেই অনুপাতে সমস্ত খরচ কষিতে সঙ্কেত করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। এই সকল জিনিস খরিদ করিতে বাহাত্তর হাজার টাকা খরচ পড়িয়াছিল।

নগদ ক্রয় ছাড়া সকল জমিদার বেগার অনেক জিনিস পাঠাইয়াছিলেন। আমরা বাড়ি তৈয়ারির একটি হিসাব দিয়াছি, বুদ্ধিমান পাঠকগণ তাহা ধরিয়া মোট খরচ অনুমান করিতে পারিবেন। ধানের হিসাবের খতিয়ান হইতে আমরা ঠিক হিসাব পাইয়াছি। ছুতার, কামার ও অন্যান্য বেগারখাটার লোকের পিছনে পনের ভরণ বাইশ নউতি ধান খরচ পড়িয়া ছিল।

মঙ্গরাজের মুখ হইতে অনেকবার শুনা গিয়াছে, তিনি কেবল পরের দুঃখ সহিতে না পারিয়া ধান ও টাকা কর্জ দেন, নহিলে তাহাতে তাঁহার নিজের লাভ কিছু নাই। আমরা বলি, বরঞ্চ লোকসান। ধান দেড়া সুদের বেশী কর্জ নাই। ইহাতে লাভ কি? দেন শুকনা পুরানো ধান, লইবার বেলা নূতন কাঁচা! আচ্ছা পাঠক মহাশয়, আপনারা ভিজা কাপড়টা আগে ওজন করুন, দেখিবেন ভিজা ও শুকনার কত প্রভেদ! গেল বৎসর খতিয়ানদার যে সালতামামি দাখিল করিয়াছিল তাহাতে মহাজনিখাতে আট টাকা ছয় আনা দুই কড়া দুই ক্রান্তি ছাড় দেওয়ার কথা হিসাব লেখা রহিয়াছে দেখা গেল। এতগুলি টাকা ছাড় দেওয়ার

দরুণ গালি খাইয়া খতিয়ানদার যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিল তাহার সার মর্ম এইরূপ : ভিকারী পণ্ডা কর্জ লইবার মূল পাঁচ টাকা তাহাতে সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বার টাকা পাঁচ আনা এগার গণ্ডা দুই কড়া, মবলগ ও আদায় সতের টাকা পাঁচ আনা দুই পয়সা বাদে বাকী ছাড় দেড় গণ্ডা।

৩ ॥ বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্ধং কৃষি কর্মণি

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তার আধা করলে চাষ। আমরা অনুমান করি ইহা কোনও মান্ধাতার আমলের কবির পদ। আজকালকার কবি হইলে এইরূপ বলিতেন :

'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তার আধা বি-এল পাস।'

মঙ্গরাজের বাড়ি দেখিয়া অনভিজ্ঞ লোকে অনুমান করিতে পারেন ইহা আদালতের কোনও বি-এল পাস উকিলের বাড়ি, বাষট্টি ঘরের ভগ্নাংশের সমষ্টি মাত্র। কথা কি জানেন, ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র। এই যে আদালতের আনাচে-কানাচে গণ্ডা গণ্ডা শামলা-পরা ঘুরিতেছে মঙ্গরাজের মত পঁচিশ ঘরের ভগ্নাংশ এক করিতে পারেন এমন কয়জনকে পাওয়া যাইবে? কর্তাবাবু নিজেই বলেন, তিনি কাহারও একটি পয়সার ধার ধারেন না। আপন বুদ্ধি, আপন বাহুবলে মাটিতে সোনা ফলাইয়াছেন। এমন শোনা যায়—শোনাই বা কেন বলি, আমরা নিশ্চয় জানি—মঙ্গরাজ প্রথমে গাঁয়ের প্রধানের দুই মাণ জমি ভাগে লইয়াছিলেন। এখন চাষের জমি খুব কম করিয়াও চার বাটি ছয় মাণ, তা ছাড়া তিন শ বাটি সতের মাণ ভাগে লাগিয়াছে। জমি সবই লাখেরাজ। কিছু সরকারী বাজেয়াপ্তি, আধা খাজনা দিতে হয়। অধিকাংশ খরিদা ব্রহ্মোত্তর। চাষের বলদ পনের জোড়া। ক্ষেতমজুর বারজন, ইহারা বারমেসে, জাতিতে বাউরী*—তিনজন পাণ†। চাষ ও বাগানের ভার ইহাদের উপর। মঙ্গরাজের শিক্ষা ও উৎসাহে ইহারা কর্মঠ ও উৎসাহী। ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করা স্বাস্থ্যবিধান শাস্ত্রের বিধি। কি রোদ, কি বৃষ্টি, কি ঝড়, কি তুফান মঙ্গরাজকে এ বিধি লঙ্ঘন করিতে কেহ কখনও দেখে নাই। শাস্ত্রে আছে :

যত দেখ নদনদী
সকলে মিলয়ে জলধি
আপন গুণ পাসরে
লবণ গুণ ভজে রে।

ঠিক কথা। সেইরূপ স্ত্রী দাস দাসী সকলে কর্তাবাবুর গুণ অল্প বিস্তর গ্রহণ করে। আমরা কর্তাবাবুর ঘরের দাসদাসীদের দেখিয়া এই

* বাউরী ॥ ওড়িশার হরিজন জাতিবিশেষ। † পাণ (উচ্চারণ অ-কারান্ত) ॥ ওড়িশার হরিজন জাতিবিশেষ।

শিক্ষা লাভ করিয়াছি। মঙ্গরাজ ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠিয়া দাঁত মাজিয়া ফেলেন। কলিকাতা শহরে দুইবার তোপ পড়ে। প্রাতঃকালের তোপ রাত্রির শেষজ্ঞাপক। মঙ্গরাজ কাছারির বারান্দায় দাঁড়াইয়া মজুরকে হাঁক দিলে গ্রামের লোক চোখ না খুলিয়াও জানিতে পারে রাত পোহাইয়াছে; বউঝিরা বাসী পাট সারিতে লাগিয়া যায়। মফস্বলের লোক ঘড়ি ঘণ্টা বোঝে না। সূর্য মাথার উপরে আসিলে বলদের কাঁধ হইতে জোয়াল নামে। আশে পাশের চাষীরা দূর হইতে তাকাইয়া দেখে, মঙ্গরাজের বড় তালপাতার ছাতা আলের উপর উঠিয়াছে কি না। মঙ্গরাজ তাঁর মজুরদিগকে পুত্রের মত পালন করেন। বাপ মা ছেলেপুলেদের খাওয়া-দাওয়া নিজে না দেখিলে মনের মত হয় না। মজুরেরা সারি বাঁধিয়া খাইতে বসিয়া গেলে কর্তাবাবু রাঁধুনীকে তারস্বরে হাঁক দেন, 'আরে আমানি আন্ আমানি আন্, এদের গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।' রাঁধুনী অভ্যস্ত বিদ্যার প্রভাবে প্রত্যেককে দুই বাটি করিয়া আমানি দেয়। কোনও মজুর এতখানি আমানি পান করিতে নারাজ হইলে কর্তাবাবু তাহার উপকারিতা ও বলকারকতা সম্বন্ধে ক্ষুদ্র এক বক্তৃতা করিয়া তাহা খাওয়াইয়া দিয়া তাহার পর ভাতের ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং স্নান করিতে বাহির হইয়া যান।

কর্তাবাবুর বাগানে সতেরটা শজিনা গাছ। শজিনার শাক হজমী, বলকারক, রোগনাশক, মুখরোচক, রোগীর পথ্য। দ্রব্যগুণ তালিকায় শজিনার এরূপ গুণবর্ণনা আছে কিনা আমরা জানিনা কারণ সে বিদ্যায় আমরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ; কিন্তু কর্তাবাবুর মুখ হইতে যথা শ্রুতং তথা লিখিতং। সেইজন্য বাগানের শজিনা শাক এক আঁটিও হাটে যায় না, মজুরদের বলবর্ধন ও পোষণের জন্য সমস্ত উৎসর্গীকৃত। এই যে শজিনা ফুল দেখিতেছ এরূপ উপাদেয় পদার্থ পৃথিবীতে নাই। চারিটি রাই যদি তাহাতে মিশে—তাহার কথা আর কি বলিব। পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে কত না ভাল জিনিস আছে—সবেতেই ভাল মন্দ মেশানো! দেখ কাঁঠালের কোয়াগুলি কত মধুর, কিন্তু তাহার ভিতরের আঁশগুলি বদহজমী। কিন্তু জ্ঞানী লোকের কাছে কোনও কিছুরই একটা সুরাহা না হইয়া যায় না। ভালর ভালটি মন্দের মন্দটি ঠিক বাছিয়া দেন। শজিনার সব ভাল, কেবল ডাঁটাগুলি খারাপ ও বদহজমী। সেইজন্য মজুর কিংবা চাকরদের পাতে পড়িতে পায় না, সরাসরি একেবারে হাটে চলিয়া যায়।

৪ ॥ চাষ তদারক

অয়ং নিজঃ পরোবেত্তি গণনা লঘুচেতসাম্‌। মণ্ডগরাজ চাষের আপন পর বুঝেন না। শাস্ত্রে বলে—লঘুচেতাগণ আপন ও পর এইরূপ বুঝেন। কর্তাবাবুর আপন চাষের প্রতি যে রকম নজর পরের চাষের প্রতিও সেই রকম। আমরা একদিনের কথা বলিলেই জ্ঞানী পাঠকগণ তাহা হইতে সব বুঝিতে পারিবেন। হাঁড়ির একটি ভাত টিপিলেই সব বুঝা যায়। সর্দার-মজুর গোবিন্দ পুহান সকালে আসিয়া জানাইল, 'আজ্ঞে দেড় মাণ জমি খালি রহিল, চারা আঁটিল না।' কর্তাবাবু 'হুঁ' বলিয়া মৌন হইলেন। মজুর হাত জোড় করিয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া রহিল।

কর্তাবাবু ক্ষেতে ঘুরিতে বাহির হইয়াছেন। পরিধানে একখানি তেলচিটা মটকার কাপড়, কোমরে গেরুয়া রংয়ের গামছা বাঁধা, কাঁধে বিশাল তালপাতার ছাতা। পিছনে গোবিন্দ পুহান ক্ষেতের হালচাল বলিতে বলিতে চলিয়াছে। আর একটি মজুর কাঁধে দুইটা জোয়াল ফেলিয়া চলিয়াছে। তাহার নাম পাণ্ডিআ। গাঁয়ের সব লোক তখনও উঠে নাই। শিবু পণ্ডিতের সহিত দেখা হইল।

পণ্ডিত নস্য শুঁকিতে শুঁকিতে বাঁ হাতে ঘটি লইয়া পুকুর পাড়ে চলিয়াছেন। কর্তাবাবুকে হঠাৎ পিছনে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সাত হাত তফাতে গিয়া ঘটিটা নীচে রাখিয়া ধনুকাকার ধারণপূর্বক, 'অঞ্জলী-বদ্ধো ভূত্বা কর্তাবাবুর কীর্তিমায়ুর্যশঃশ্রিয়ং' কামনা করিলেন। কর্তাবাবুর সেদিকে দৃষ্টি নাই, একদিকে তাকাইয়া চলিয়াছেন। কর্তাবাবু কিছুদূর যাইবার পর পণ্ডিত ধীরে ধীরে ঘটিটি তুলিয়া এই শ্লোকটি আওড়াইলেন : অদ্যপ্রাতরেবানিষ্ঠ দর্শনং জাতং নজানে কিমভিমতং দর্শয়িষ্যতি। পণ্ডিত-দিকের শ্লোক আওড়ানো অভ্যাস, আমাদের তাহাতে কি?

শ্যাম গোছাই জাতে বাউরী, তার খামার গাঁয়ের ধারে। আগেই রোয়া হইয়াছিল বলিয়া সমস্ত জমিটা সবুজ হইয়া গিয়াছে। শ্যাম নুইয়া পড়িয়া আল বাঁধিতেছে। কর্তাবাবু কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া কোমল কণ্ঠে বলিলেন, 'এই যে বাবা শ্যাম!' শ্যাম হঠাৎ কর্তাবাবুকে দেখিয়া চমকিয়া গেল। পাঁচ হাত দূরে কোদালটা ফেলিয়া দিয়া কাদার উপরেই শুইয়া পড়িয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল। 'আরে ওঠ, আরে ওঠ, আরে ওঠ' বলিয়া সস্নেহে কর্তাবাবু সম্বোধন করিলেন, তারপরে শ্যাম হাত জোড়

করিয়া দশ হাত তফাতে দাঁড়াইল। অতঃপর শ্যাম ও কর্তাবাবুর মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া সুখ-দুঃখের কথাবার্তা হইল। সমস্ত কথা লিখিলে পাঠকগণ বিরক্ত হইতে পারেন, সেইজন্য সারাংশমাত্র লিখিতেছি।

শ্যামের বংশের উপর কর্তাবাবুর ভারী নজর। শ্যামের বাপ অপার্তিআ রোজ সন্ধ্যায় গিয়া কর্তাবাবুকে ক্ষেতখামারের হালচাল জানাইত এবং কি করিয়া চাষ করিলে ধান খুব ফলিবে এসব কথা জিজ্ঞাসা করিত, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শ্যাম তাহা করেনা। ইত্যবসরে ক্ষেতের উপর কর্তাবাবুর যেন অকস্মাৎ নজর পড়িয়া গেল। যেন চমকিয়া গিয়াছেন এমনি সুরে বলিলেন, 'আরে শ্যামা তুই করেছিস কি? তুইতো দেখছি নেহাত বোকা! চাষবাসের কিছুই জানিস না। আরে এত ঘন করে রুলে কি ধান ফলে? গাছের তো নিশ্বাস ফেলবার জায়গা রাখিস নি। ওপ্ড়া ওপ্ড়া, অর্দ্ধেক উপড়ে ফেল।'

গোবিন্দ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া কর্তাবাবুর সমর্থন করিল। শ্যাম হাত জোড় করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'আজ্ঞা আমি তো চিরকালই এমনি করে রুই, সকলেই রোয়।'

কর্তাবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আরে উল্লুক, ভাল কথা বললে শুনিস না।' গোবিন্দর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আরে গোবিন্দ, দেখিয়ে দে তো।'

এই কথা মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে গোবিন্দ ও পাণ্ডিআ দুই কেয়ারি ক্ষেত অর্ধেক সাফ করিয়া ফেলিল! শ্যাম ডাক পাড়িয়া কর্তাবাবুর পায়ে লুটাইতে লাগিল। কর্তাবাবু রাগিয়া গিয়া মা ঠাকরুণের সহিত শ্যামার ভাই সম্বন্ধ ধরিয়া বলিলেন, 'তুই চাষ করতে জানিস আর নাই জানিস, কর্জ ধানের সুদ এক বিশ্বা* করে আদায় করলে তবে জানবি।' শ্যাম ভয়ে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কর্তাবাবু 'আরে গোবিন্দ, থাক্ থাক্, ও তার যা ইচ্ছা হয় করুক' এই বলিয়া বোঝা দুইটা লইয়া নিজের না-রোয়া ক্ষেতের দিকে চলিয়া গেলেন।

* বিশ্বা॥ ধান ইত্যাদির মাপ। ১৬ বিশ্বা=১ গাউনী। ৮০ গাউনী=১ ভরণ। আবার জমির মাপও হয়। ১৬ বিশ্বা=১ গুণ্ঠ, ২৫ গুণ্ঠ=১ মাণ।

৫ ॥ মঙ্গরাজের পরিজন

রামচন্দ্র মঙ্গরাজ মহাশয় বহু লোকের ভরণ-পোষণ করেন। ঘরে অনেকগুলি পোষ্য। খোদ কর্তাবাবু ও মাঠাকরুণ বাদে তিন ছেলে হিসাবে তিন বউ, দাসীচাকরাণী কুড়ি অথবা বাইশ—এমনি করিয়া ত্রিশের কাছাকাছি। প্রত্যেকের কথা লিখিতে গেলে অনেক লিখিতে হইবে। কিন্তু আপনারা তো আমাদের স্বভাব জানেন, মিথ্যা কথা লেখা, অত্যুক্তি করিয়া লেখা, অকারণ লেখা আমাদের ধাতে নাই। তা ছাড়া মা লিখেৎ সত্যমপ্রিয়ম্, অর্থাৎ সত্য কথারও অর্ধ প্রমাণ বাদ দিতে হয়। বাড়ির ভিতরে নারীর সংখ্যা বেশী, রাম-অ নাপিত ছাড়া পুরুষের গলা প্রায় শোনা যায় না। কর্তাবাবু তো নানা ধান্দায় ব্যস্ত। তিন ছেলে জোয়ান; পাশাখেলা, বুলবুলি ধরা, লোকের সহিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধান—তাহাদের সময়ে কুলায় না। নেশা-ভাঙ করিতেও কিছু সময়ের আবশ্যক। গোবিন্দপুর হাটের গাঁজার দোকানী এক খদ্দেরের উপর চটিয়া বলিয়াছেন, 'আরে যা যা! মাল না নিলে, না নিলে, একা জমিদার বাড়ির বাবুদের জন্যই কুলায় না।' বাপ ও ছেলেদের বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। মুরুব্বি গোছের কেউ একবার বলিয়াছিল, 'ওহে মঙ্গরাজ, ছেলেদের কাছে ঘেঁষতে দাওনা কেন?' মঙ্গরাজ উত্তর দিলেন, 'আহা, তুমি কি শাস্ত্র শোন নি?'

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥

অর্থাৎ ছেলেদের মুখ হইতে পাঁচ বছর পর্যন্ত লাল পড়ে, দশ বছর পর্যন্ত তাহাদের তাড়া দিবে; ষোল বছর হইবার পর তাহাদের সহিত ও মিত্রদিগের সহিত বদ অর্থাৎ খারাপ আচরণ করিবে।

বাস্তবিক দেখা যায় কর্তাবাবু কাহারও কাহারও সহিত সাঙাত বন্ধু পাতাইয়া, মামলা মোকদ্দমা বাধাইয়া, তাহাদের জমিজমা কাড়িয়া লইয়া বদ আচরণ করেন। তবে পুত্রদিগের সম্বন্ধে যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিলেন তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। শুনা যায় ছেলেরা নেশা-ভাঙ করিয়া কিছু উড়াইয়া দেওয়াতে বাপের সহিত বনিবনাও হয় না।

বাড়ির ভিতর মাঠাকরুণ একটি ঘরে পড়িয়া থাকেন, কাহারও সঙ্গে রা-টি কাড়েন না। কেবল ভিখারী, বৈরাগী, উপসী, পিয়াসী আসিলে

তাঁহার খোঁজ করে।

বউদের কথা লেখা অনুচিত। বড়লোকের ঘরের কুলবধূদের কথা হাটে ফেলিলে লোকে আমাদের বলিবে কি? তাহারা যে এক প্রহর বেলায় বিছানা হইতে উঠিয়া দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে দাঁত মাজা, তেল মাখা, স্নান ইত্যাদি সারিয়া আহারাদি করিয়া বেলা পড়িয়া যাওয়া পর্যন্ত ঘুমাইয়া নেয় সে কথাগুলি লিখিয়া কি হইবে? পড়ন্ত বেলায় আবার উঠিয়া দেখিতে দেখিতে পান্তাভাত সারিয়া তারপর গাঁয়ের কথা শোনা, দাসীদের মধ্যে ঝগড়া লাগাইয়া দেওয়া, ঝগড়া মিটানো, হাসি মস্করায় রাত দুপুর হইয়া যায়।

রুকুণী, মরুআ, চেমী, নাকফোড়ী, টেরী, বিমলি, শুকী, পাট-অ. কৌশুলী বাদে আরও কতগুলি দাসী আছে। তাহাদের নাম আমাদের জানা নাই। কেহ বালবিধবা, কেহ যুবতী-বিধবা, কেহ আজন্ম বিধবা, কেহ বা সধবা। নানা পক্ষী যেমন এক বৃক্ষে বাস করে তেমনি ইহারা সকলে মঙগরাজের ঘরে আশ্রয় লইয়াছে। আবার কত আসিতেছে কত যাইতেছে তাহার ঠিকানা নাই। অনেকগুলি নিষ্কর্মা দাসী একত্র হইলে বিশ্বের বিবাদ সৃষ্টি হয়, মঙগরাজের বাড়ি এই সনাতন বিধি লঙ্ঘন করে নাই। রাতদুপুর পর্যন্ত বাড়ির ভিতরে মেছোহাটার ন্যায় চেঁচামেচি শোনা যাইতে থাকে।

৬ ॥ চম্পা

বাড়ির ভিতরে যত লোক রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে চম্পা ওরফে চম্পা ঠাকরুণ ওরফে হরকলার* সহিত মঙ্গরাজের কি সম্পর্ক একথা কাহারও জানা নাই। তাহার জাতিকুল, পিতৃবংশ সম্বন্ধেও সকলে অজ্ঞ। চম্পা মঙ্গরাজের বাড়ির দাসী কি ঠাকরুণ ব্যবহারে বুঝিবার কাহারও শক্তি নাই। কেবল এইটুকু বলিতে পারি যে মঙ্গরাজের বাড়ির চৌহদ্দির ভিতরে চম্পার ক্ষমতা অসীম। অধিক কি মাঠাকরুণের ক্ষমতার চাইতেও অনেক বেশী। বাহিরের মজুর জন মায় কাছারির নায়েব গোমস্তা তাহার কাছে হাত জোড় করিয়া থাকে।

চম্পার একটি নাম হরকলা, বাস্তবিক এই নাম ধরিয়া কাহাকেও তাহাকে ডাকিতে শুনি নাই। হরকলা শব্দের ব্যুৎপত্তি কি, এই নামটি নিন্দার কি প্রশংসার ইহা বলিতে আমরা নিতান্ত অক্ষম। কিন্তু চম্পার কানে একদিন কে তুলিল যে লোকেরা তাহাকে হরকলা বলে। সে শুনিয়া ভারী রাগ করিল; কাঁদিতে কাঁদিতে মঙ্গরাজের কাছে গিয়া নালিশ করিল। ফলে খুব ধরপাকড় হইল, দুই দিন ধরিয়া খোঁজখবর নেওয়া চলিল, কিন্তু হরকলা নামের উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহা কতদূর বিস্তৃত, কোনও ঠিকানা মিলিল না। অবশেষে কর্তাবাবু বলিলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে। খবরদার! চম্পাকে কেউ হরকলা বলো না।' সেদিন গ্রামের এ মুড়া হইতে ও মুড়া পর্যন্ত এবং আশেপাশে দুই চারিখানি গ্রামের সকলে সকলকে সাবধান করিয়া দিল, 'খবরদার! চম্পাকে কেউ হরকলা বলো না।' একমাস দুইমাস চারিমাস ছয়মাস পর্যন্ত ছেলে বুড়া সকলে ইয়ারবন্ধু দেখিলেই চারিদিকে একবার চাহিয়া মুচকিয়া হাসিয়া পরস্পরকে সাবধান করিয়া দেয়, 'খবরদার! চম্পাকে কেউ হরকলা বলো না।' ক্রমশঃ সেই কথা সংক্ষিপ্তসার রূপ ধারণ করিল, যথা—খবরদার কেউ চম্পাকে—খবরদার কেউ—খবরদার, ইত্যাদি। ছেলেগুলা হাততালি দিয়া রাস্তায় নাচে :

খবরদার!
গোবরা জেনা চউকিদার।

ছেলেরা চিরকালই ফ্যাসাদ বাধায়, তাহাদের কথা ধরিলে তো আর চলে

* হরকলা ॥ নানা অসৎ বিদ্যায় পারদর্শী।

না! যাক্, ও বাজে কথায় কি হইবে? তবে কর্তাবাবুর বাড়ির সহিত চম্পার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় পাঠকরা তাহার নাম অনেকবার শুনিতে পাইবেন। এই কারণে তাহার রূপ-গুণ সম্বন্ধে সমস্ত কথা খুলিয়া বলা আমাদের পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য। আর গ্রন্থস্থ নায়কনায়িকাদের রূপ-গুণ-বর্ণনা করিতে লেখকগণ সাহিত্যের আইন অনুসারে বাধ্য। সুতরাং এই সনাতন রীতি লঙ্ঘন করিতে আমরা সমর্থ নহি। আবার গ্রন্থকারদেরও দোষ আছে। একটি নায়িকাকে পাইলে তাঁহারা যেন হাতে স্বর্গ পান, সব ভুলিয়া অমনি তাহার রূপ-বর্ণনা করিতে বসিয়া যান। আমরা যে রূপবর্ণনায় অক্ষম তাহা নহে। এই দেখ আম কাঁঠাল কলা ডালিম জামির এইরূপ যে সকল গাছ পাতা ফল ফুল আছে চম্পার বিশেষ বিশেষ অঙ্গের সহিত বিশেষ বিশেষ পদার্থ মিলাইয়া দিলে তো রূপবর্ণনা হইয়া গেল। কিন্তু আজকাল এরূপ মান্ধাতার আমলের বর্ণনা চলিবে না। ইংরেজি পড়ুয়া পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য ইংরেজি ধাঁচে রূপবর্ণনা আবশ্যক। ভারতের কবিরা সুন্দরী রমণীকে বলেন 'গজেন্দ্রগামিনী', ইংরেজ বলিবেন, ছি ছি! তাহাতো নহে, ঘোড়ার মত যে 'গ্যালপে' চলিতে পারে সেই না পরমা সুন্দরী। আমরা দেখিতেছি আজকাল পয়লা আষাঢ়ে মহানদীর বানের জলের ন্যায় এ দেশে ইংরেজি সভ্যতা যে রূপে ঠেলিয়া আসিতেছে তাহাতে খুব সম্ভব নব্যসভ্য শিক্ষিত বাবুরা আপন আপন অঙ্কলক্ষ্মীদের 'গ্যালপ্' চাল শিখাইবার জন্য চাবুক সওয়ার নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া বসিবেন। সে যাহা হউক, আমরা বলি সুন্দরীদের চলনের উপমেয় বস্তু পুরানো কোনও কবি ঠিক করিতে পারেন নাই। ভাবিয়া দেখুন, ঘোড়া ও হাতী চার পায়ে চলে, অথচ আমাদের চম্পার দুইটির অধিক পা নাই। সুতরাং তাহাকে গজেন্দ্রগামিনী বা অশ্ববরগামিনী বলা নিতান্ত অসঙ্গত। তবে চম্পা হামাগুড়ি দিয়া চলিলে কি রকম দেখাইত সে কথা অনুমান করিয়া বলিতে আমরা সম্প্রতি অক্ষম। আবার পদসংখ্যা সম্বন্ধে মরালের সহিত সামঞ্জস্য থাকায় তাহাকে মরালগামিনী বলা অসঙ্গত নহে। অলঙ্কার শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষার জন্য উপমান উপমেয় ঠিক রাখিয়া বলিতে গেলে আগে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে মরাল কখনও কেবল পায়ে কখনও বা ডানা মেলিয়া আধা উড়ার মত চলে। আমাদের চম্পা যখন গ্রামের পথ দিয়া মাণিআবন্ধের* শাড়ির আঁচল উড়াইয়া দুই হাত দোলাইয়া চলিয়া যায় তখন তাহাকে ঠিক মরালগামিনী বলা যাইতে পারে। চম্পার বয়স

* মাণিআবন্ধ॥ রেশম পাড় ধুতি ও শাড়ির জন্য প্রসিদ্ধ ওড়িষ্যার এক স্থান।

আমরা অনুমান করি ত্রিশের কাছাকাছি। কিন্তু তাহার নিজের মুখ হইতে অনেকবার শোনা গিয়াছে যে মাঠাকরুণের শুভবিবাহের দিন তাহার একোইশা* হইয়াছিল। এই হিসাবে চম্পার বয়স ঢের কম। এরূপ যুবতীর রূপবর্ণনা করিতে হইলে খুব সাবধানতা, খুব বিজ্ঞতা, খুব বহুদর্শিতা আবশ্যক। বিলাতী জিনিসআদির সহিত রুচি নামধেয় পদার্থবিশেষ এ দেশে নূতন আমদানী হইয়াছে। তাহার প্রতি নজর রাখিয়া না চলিলে তুমি গিয়াছ! তুমি মূর্খ অসভ্য বলিয়া গণ্য হইবে। সে দিন উপেন্দ্র ভঞ্জের† দুর্দশা দেখিয়া আমরা এই শিক্ষা পাইয়াছি। বাপ মায়ের পুণ্যবলে বেচারা পার পাইয়া গিয়াছেন, নহিলে মহাপাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মহারাজা পর্যন্ত যেরূপ পিছনে লাগিয়াছিলেন তাহার কপালে যে কি ঘটিত ভগবানই জানেন। এরূপ মহারথীর তো এই দশা, আমরা তো চুনাপুঁটি! গুরুবিপ্রপ্রসাদেন আমরা সুরুচির কবিতা কিছু কিছু রচনা করিতে সক্ষম। আপনি ভাবিতেছেন লোকটা মিথ্যাবাদী কিছু জানেনা। আচ্ছা নমুনা দেখুন :

অর্ধবক্ষ উলঙ্গিনী, মুচকিহাসিনী,
বস্ত্রশূন্যা রিক্তহস্তা তুরঙ্গগামিনী,
মার্জারনয়না, তাম্রকেশা, কোমর-বাঁধা,
স্বাধীনভর্তৃকা, পাঁচজনের চক্ষুধাঁধা,
পরপুরুষ সাথে করি নর্তকী সুন্দরী,
আহা আহা অপরূপ স্বর্গ বিদ্যাধরী!

আর কুরুচিপূর্ণ উপেন্দ্র ভঞ্জ শুনিবেন?

উলট কদলী প্রায় জানু,
নিতম্বযুগল জিনি সানু।

আর লিখিতে সাহস হয় না। কি জানি যদি আবার বিজুলী‡ চমকিয়া উঠে। আমরা সুরুচির কবিতা লিখিতে জানি বটে, তবে দিনদুপুরে ডাহা মিথ্যা লিখিতে ভরসা পাই না। বালিপাটনার বালিকা বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী চেমী বেহারা হইতে সুরু করিয়া বেথুন স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রী মিস্ এস্ এম্ রে ওরফে কুমারী শশিমুখী

*একোইশা॥ ওড়িষ্যায় নবজাতকের একুশ দিনে করণীয় সংস্কার।

†উপেন্দ্র ভঞ্জ॥ ওড়িষ্যার অষ্টাদশ শতাব্দীর মহাকবি, স্বকীয়া প্রীতিজনিত আদিরস ও অলোকসামান্য অলঙ্কারচ্ছটার জন্য প্রসিদ্ধ।

‡ 'বিজুলী' নামে এক আধুনিক পন্থী ওড়িয়া মাসিকপত্রে প্রাচীন কবি উপেন্দ্র ভঞ্জের উদ্দেশে তীব্র সমালোচনা বাহির হইয়াছিল।

রায় পর্যন্ত দেখিলাম। কেহই সুরুচিসম্পন্ন সৌন্দর্য বাড়াইয়া বিড়ালের চোখের ন্যায় করিতে পারে নাই। এদিকে সত্য লিখিলে লোকে অসভ্য বলিবে, মিথ্যা তো কলমের আগায় বাহির হইবে না। উপায় কি? কালিদাস রঘুবংশ লিখিবার সময় কলম অচল হওয়ায় বলিয়া বসিলেন :

অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেৎস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ

এখন তো পথ দেখিতে পাইলাম; স্বয়ং কালিদাস চম্পার রূপবর্ণনার নমুনা রাখিয়া গিয়াছেন :

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী

অস্যার্থ, তনু কি না শরীর, চম্পার শরীর থাকায় সে তন্বী। শ্যামা কি না কালো নহে, ফরসা নহে, শ্যাম বর্ণ, চম্পা শ্যাম বর্ণা। শিখরি-দশনা—শিখরি কি না পাহাড়, দশন কি না দাঁত; চম্পার সামনের দাঁত দুইটা বেয়াড়া হইয়া একটির উপর আর একটি উঠিয়া পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় উচু হইয়া থাকাতে সে শিখরিদশনা। আর পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী—পক্ক কিনা পাকা, বিম্ব কি না তেলাকুচা, অধরোষ্ঠ কি না নিচের ও উপরের ঠোঁট; অর্থাৎ পানের পিচে চম্পার দুই ঠোঁট লাল হইয়া যাওয়াতে সে পক্ক-বিম্বাধরোষ্ঠী, ইত্যাদি।

আবার কালিদাস 'মধ্যে ক্ষামাস্তোকনম্রা' প্রভৃতি অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু চম্পার যে সকল অঙ্গ বস্ত্রাবৃত, অর্থাৎ আমরা যে সকল অঙ্গ দেখি নাই সে সকল অঙ্গের বর্ণনা করিতে একেবারেই নারাজ। কালিদাস তো কালিদাস, যাহা না দেখি দুই নয়নে, তাহা না লিখি গুরুবচনে। তবে দেখা স্থানগুলি বর্ণনা করিতে ছাড়িবার পাত্র আমরা নহি। যথা—

কজ্জল পূরিত লোচন ভালে।
দোক্তার খিলিপান ঠাসা দুই গালে॥ ১॥
তৈলহরিদ্রা লেপিত দেহে।
কুক্কুরীব শীঘ্রং ধাবতি গেহে॥ ২॥
ষোলহাতীশাড়ীবিস্তৃতকচ্ছে।
থুপিবাঁধাকবরী শোভিত উচ্চে॥ ৩॥
দুপ দুপ দুম দুম চলনং তস্যা
চলতি বা ধাবতি বিষম সমস্যা॥ ৪॥
কঙ্কণ চুড়ি হস্তে বিরাজে।
ঝম ঝম ঝম ঝম ঘুঙুর বাজে॥ ৫॥

সা যদা গচ্ছতি গ্রাম্য বাটে।
হস্ত দোলাইয়া নায়িকা ঠাঁটে॥ ৬॥
দেখিয়া ভয় খায় গ্রাম্য লোক।
তরাসে পলাইয়া যায়ও কতক॥ ৭॥
ইতি রূপবর্ণনং পজ্ঝটী ছন্দে।
অতঃ গুণ বর্ণ্যতে বিবিধ প্রবন্ধে॥ ৮॥

৭ ॥ বুড়ি মঙ্গলা

> যা দেবী বৃক্ষমূলেষু শিলারূপেণ সংস্থিতা।
> নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
> মৃত্তিকাশ্বগজারূঢ়া বন্ধ্যায়াঃ পুত্রদায়িনী।
> ওলাসংহারিণী দেবী নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

অসুর দীঘির পশ্চিম কোণের গাঁয়ের ভিতর হইতে দীঘিতে যাওয়ার পথের ডান দিকে একটি বিশাল বটগাছ আছে। গাছের গুঁড়ির চিহ্ন নাই, কুড়ি পঁচিশটা ঝুড়ি নামিয়া ডালগুলি পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া গাছটি প্রায় বার তের গুণ্ঠ* জায়গা জুড়িয়া আছে। ছোট ছোট ডাল ও পাতাগুলি এমন ঘন হইয়া উঠিয়াছে যে নিচে মোটে রোদ পড়ে না। গাছটি বহুকালের। প্রবীণ লোকেরা বলেন এটি সত্যযুগের ঠাকুরাণী গাছ। তাঁহারা ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছেন ইহা বাড়েও না কমেও না। গেল সাত অঙ্কের† কার্তিক মাসের উপবাসের দিন একটি ভারী তুফান হইয়াছিল, গাঁয়ের সমস্ত শজিনা গাছ এবং কলাগাছের গোড়া উপড়াইয়া গেল, এ গাছের একটি পাতাও ঝরিল না। ঠাকুরাণীর মহিমা!

মাঝখানে চারিটি ঝুরি গাছের মত দাঁড়াইয়া আছে, তাহার গোড়ায় গ্রামদেবীর আস্থান। ঠাকুরাণীর নাম বুড়ি মঙ্গলা। মঙ্গলাঠাকুরাণীর আড়াই মাণ দেবোত্তর জমি আছে। বার গুণ্ঠ আট বিশ্বা‡ খোদ আস্থান-স্থলী, বাকী দুই মাণ নাবাল জমি পূজারী ভোগ করে ও ঠাকুরাণীর পূজা করে। গ্রামে বিশেষ করিয়া মেয়েদের মধ্যে পূজারীর ভারী মহিমা। ঠাকুরাণী স্বপ্নে পূজারীকে দেখা দিয়া থাকেন, সব কথা বলেন। কাহারও খিড়কির কলাটা বেগুনটা কুমড়াটা ফলিলে প্রথম ফলটা ঠাকুরাণীকে না দিয়া সে খায় না।

মণ্ডপটি পাকা গাঁথুনির তৈয়ারী। মাঝখানে ঠাকুরাণীর নিজমূর্তি।

* গুণ্ঠ॥ জমির মাপ বিশেষ: ২৫ গুণ্ঠে এক মাণ (এক একরের মত)। এক গুণ্ঠ প্রায় আড়াই কাঠার সমান।

† অঙ্ক॥ পুরীর রাজার অভিষেক হইতে গনিতাব্দ, কিন্তু এই গণনায় ১, ৬, ১৬, ২০. ২৬, ৩০ ইত্যাদি অঙ্কগুলি ডিঙাইয়া যাওয়া হয়।

‡ বিশ্বা॥ জমির মাপ; ষোল বিশ্বায় এক গুণ্ঠ।

মূর্তিটি খুব বড়, ওজনে দশ পসুরির* কম হইবে না, দুই চারিটা হলুদ বাটা শিল মিশাইলে যত বড় তাহার চাইতেও বেশী হইবে। সমস্তটিতে চারি আঙগুল পুরু করিয়া সিন্দুর লেপা। বড়ঠাকুরাণী বাদে আরও চারিটি ছোট মূর্তি আছে। মণ্ডপের ডানদিকে কিছু দূরে শক্ত মাটির তৈয়ারী ভাঙগা হাতী ঘোড়া একপণ কি দুইপণ জমা হইয়া আছে। ঠাকুরাণীকে মাটির হাতী বা ঘোড়া চড়িতে দিলে ছেলেপুলেদের অসুখ সারিয়া যায়। বড় বড় লোকের অসুখও সারিতে দেখা ও শোনা গিয়াছে। এইজন্য ঠাকুরাণীর হাতীশাল ঘোড়াশাল কখনও খালি পড়িয়া থাকে না। দেবীর পূজা প্রতিদিন হয় না। শুকনা পাতা ও ধুলায় ঢাকা পড়িয়া থাকে। বিবাহ, পুনর্বিবাহ বা কাহারও ছেলেপুলের ব্যারাম আরাম হইলে কিংবা কাহারও মানসিক থাকিলে পূজা হয়। গাঁয়ে ওলা-উঠা লাগিলে পূজার ধুম পড়িয়া যায়। কেরাণীদের মত মাসে মাসে আয় ঠাকুরাণীর নাই। বিপদ আসিয়া পড়িলে উকিল বা ডাক্তার বাড়ির মত ঠাকুরাণীর আস্থান হঠাৎ সরগরম হইয়া উঠে। গাঁয়ের লোকের চাঁদায় পূজার খরচ চলে। ঠাকুরাণী ভারী জাগ্রত দেবতা, ইঁহার অনুগ্রহে গাঁয়ে আপদ বিপদ ঘটে না। কখনও কখনও ওলামাসীবুড়ী প্রবল হইয়া গাঁয়ে ঢুকিয়া পড়েন, কিন্তু ভাল করিয়া পূজা দিলে পঞ্চাশ কি একশ জনের বেশী লইতে পারেন না, ছাড়িয়া পালান।

আপনি সভ্য পাঠক, একথা শুনিয়া হাসিবেন, বিজ্ঞানশাস্ত্র দেখাইয়া বলিবেন রোগ হইলে ঔষধ খাও, ঠাকুরাণীর পূজা কি? আচ্ছা, আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি বাংলার এপিডেমিক ফিভার ও বম্বের [প্লেগ ঔষধ খাইয়া গিয়াছিল কি? ইহা ছাড়া বন্ধ্যাদের পুত্রকামনা আছে। ঠাকুরাণীর]† বিশেষ পূজা পাইবার ইহা একটি বিশেষ কারণ। কে কে বা কয়জন বন্ধ্যা দেবীর বরে পুত্রলাভ করিয়াছে তাহার সবিশেষ ফিরিস্তি দিতে পারিব না, তবে আমরা নির্মাল্য ছুঁইয়া বলিতে পারি গ্রামের যে স্ত্রীলোকেরা সন্তানবতী হইয়াছে প্রথম বিবাহের সময় তাহারা বন্ধ্যা ছিল। পূর্বে বলিয়াছি ঠাকুরাণীর সামনে দিয়া দীঘিতে যাইবার একটি পথ আছে। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা সেই পথে যাওয়া আসা করে। একটি স্ত্রীলোক—বয়স আন্দাজ ত্রিশ হইবে—প্রতিদিন স্নান করিয়া আসিয়া

* পসুরি॥ ওজন বিশেষ; ১ পসুরি=আনুমাণিক ৫ সের।

† 'দু মাণ আট গুণ্ঠ' ও 'ফকিরমোহন গ্রন্থাবলী'র যে সংস্করণ পাওয়া যায় তাহাতে এইখানে কতক বাদ পড়িয়া গিয়াছে মনে হয়। বন্ধনীর অন্তর্গত লেখাম্বারা তাহা অনুমানে পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।—অনুবাদক।

কাঁকাল হইতে কলসীটি নামাইয়া ঠাকুরাণীর সামনে রাখে, তারপর ঝাঁটা দিয়া দেবীর সামনেটা ঝাঁট দিয়া, কলসী হইতে এক গণ্ডুষ জল লইয়া ঠাকুরাণীর গাছের গোড়ায় দেয় ও মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া আস্তে আস্তে কি যেন জানায় এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা একটি সলিতা জ্বালাইয়া আনিয়া ঠাকুরাণীর স্থানে সন্ধ্যা দিয়া কি যেন প্রার্থনা করে। ছয় মাস হইল তাহাকে এরূপ করিতে লোকে দেখিতেছে। তাহার মনের কথা কেহ জানে না কারণ স্ত্রীলোকটি বড় লাজুক, সব সময়েই ঘোমটা দিয়া থাকে, কাহারও সঙ্গে মিশে না, কাহারও সহিত কথা কহে না।

গ্রামের রাখাল ছেলেরা দুপুরবেলায় মাঠে গরু চরিতে দিয়া ঠাকুরাণীর নিকটে গাছতলায় খেলা করে। হঠাৎ খেলা ছাড়িয়া পাঁচনবাড়ি হাতে সকলে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের দেখাদেখি গাঁয়ের দশ পনেরজন লোক জমা হইয়া গেল। কাল তো পূজা হয় নাই, ঠাকুরাণীর কাছে পূজার উপকরণ কোথা হইতে আসিল। জবা ফুল, গাঁদা ফুলের মালা, খই, মুড়কি চারিদিকে পড়িয়া আছে, ঠাকুরাণীর গায়ে টাটকা হলুদ লাগিয়া রহিয়াছে। ঠাকুরাণীর পূজা গ্রামের মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনা। চাঁদা তোলা হয়, বাজনা বাজে, গাঁয়ের সকলে দেখিতে আসে। পূজা সন্ধ্যার সময় হয়, মানসিকের পূজাও সেই ভাবেই হয়। কই কাল তো বাজনা বাজে নাই, সন্ধ্যাবেলায় পূজা হয় নাই, এ সকল কোথা হইতে আসিল? একটি ছেলে ডাক পাড়িয়া বলিল, 'এটা কি? এটা কি?' সকলে ছুটিয়া গিয়া দেখিল ঠাকুরাণীর পিছনে মাটির উপরে একটি প্রকাণ্ড গর্ত। গর্তের মুখ ঠাকুরাণীর মণ্ডপ হইতে তিনহাত দূরে। মুখটা খুব বড়, একজন মানুষ গিয়া বসিতে পারে। সারা গাঁয়ে কথাটা ছড়াইয়া গেল। লোকেরা দেখিতে ছুটিল। মঙ্গরাজও শুনিতে পাইয়া দেখিতে আসিলেন। নানা কথার পর শেষে স্থির হইল কোনও ভক্তের দুঃখ দূর করিবার জন্য ঠাকুরাণী কাল নিশীথ রাত্রে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। গর্তটা তাঁহার বাঘে খুঁড়িয়াছে। মঙ্গরাজ বলিলেন এই গর্তের মধ্যে এখনও বাঘ আছে বোঝা যাইতেছে। বাঘের নাম শুনিয়া সকলে পলাইল। শেষে মঙ্গরাজ রামার* মুখের দিকে একবার তাকাইয়া চলিয়া গেলেন। বোধ করি ইহা কোনও কার্যের সঙ্কেত। তারপরের দিন আর কেহ গর্ত দেখিল না। কথাটা লইয়া গ্রামে অনেকদিন ধরিয়া আলোচনা চলিল। ভীমার মা নাপিতানী বলিল, 'আমার বয়স সাত গণ্ডা কি দেড় পণ কি চার পণ

*রামা তাঁতী॥ সম্ভবতঃ প্রমাদবশতঃ জগা নাপিত স্থলে রামা তাঁতী হইয়াছে; প্রথম ও ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।—অনুবাদক।

হল। গ্রামের যত বুড়ো দেখছ আমি সকলের বিয়ে দিয়েছি, সকলে আমার কাছে ছেলেমানুষ। আমি নিজের চোখে ঠাকুরাণীকে এবার নিয়ে চারবার দেখেছি। কাল নিশুতি রাতে বাইরে যাব বলে উঠেছিলাম, পথের মাঝখান থেকে ধুনোর গন্ধ এল, ঝমর ঝমর শব্দ শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি বাঘের উপরে চড়ে ঠাকুরাণী আসছেন। বাপরে সে কত বড় বাঘ! আমি কত বাঘ দেখেছি, এত বড় বাঘতো কোথাও দেখি নি। লম্বায় সাত হাত কি আট হাত হবে। বড় মদ্দা মোষের মাথার মত এই বড় মিশকালো মাথা। বাঘটা আমার দিকে কটমট করে তাকাল। আমিতো ভয়ে ঝাঁপ বন্ধ করে দিলাম।' অর্ধরাত্রে পথে বাঘ চলিবার শব্দ শুনিয়াছে বলিয়া চার পাঁচজন বুড়া মানুষও সাক্ষ্য দিল। সকালে বাঘ দেখিয়াছে বলিয়া খোদ রামা তাঁতী হলপ করিয়া বলিল। ঠাকুরাণী আসিয়াছিলেন বলিয়া নিঃসন্দেহে স্থির হইল।

৮ ॥ জমিদার শেখ দিলদারমিঞা

শেখ কেরামৎ আলির বাড়ি প্রথমে আরা জেলায় ছিল। এখন মেদিনী-পুর জেলায়। তাঁহাকে সকলে আলিমিঞা বলিয়া ডাকে, আমরা সেই নামই লিখিব। আলিমিঞা প্রথমে ঘোড়ার সওদাগর ছিলেন। পশ্চিমে হরিহর ছত্রের মেলায় ঘোড়া কিনিয়া বাংলা ও ওড়িষ্যায় বিক্রি করা তাঁহার ব্যবসা ছিল। মেদিনীপুর জেলার বড়সাহেবকে একটা ঘোড়া বিক্রি করিয়াছিলেন, সে ঘোড়াটি ভাল হওয়ায় সাহেব ভারী খুশী হইয়া মিঞাকে তাঁহার ব্যবসায় ও রোজগার সম্বন্ধে অনেক কথা মেহেরবানি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সওদাগরিতে বিশেষ লাভবান হয় না শুনিয়া তাহাকে একটি চাকরি দিবার ইচ্ছা হওয়ায় আলিমিঞা লেখা-পড়া জানেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। মিঞা বলিলেন, 'হুজুর, আমি পারসী জানি, কাগজ-কলম দিন আমার নাম পুরা লিখে দিব।' পূর্বে পারসী বিদ্যার ভারী আদর ছিল। আদালতে চলতি বিদ্যা ছিল পার্সী। ভারতের ভাগ্যবিধাতা এইরূপ কলমের খোঁচা দিয়াছেন। কাল ছিল পার্সী, আজ হইল ইংরেজি, ইহার পর কি হইবে তিনিই জানেন। তবে একথা ঠিক যে দেবনাগরীর কপাল পাথরে চাপা। ইংরেজি পণ্ডিতরা বলেন সংস্কৃত মৃত ভাষা। আমরা সে কথা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি, ইহা আধমরা লোকের ভাষা, সে কথা থাক। সাহেবের মেহের-বানিতে মিঞাসাহেব একটি চাকরি পাইলেন, সে চাকরির নাম থানাদারি। মিঞাসাহেব কখনও সবিঘ্নে কখনও নির্বিঘ্নে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া চাকরি করিয়া অনেক বিষয়সম্পত্তি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। বাড়ি, বাগ বাগিচা, আসবাব বাদে জমিদারী তালুক চারিটি। পূর্বে ওড়িষ্যার জমিদারি-সকল কলিকাতায় নিলাম হইত। মিঞা একবার একটা খুনী মামলার চালান লইয়া কলিকাতায় গিয়া তালুক ফতেপুর সরষণ্ড নিলামে কিনিলেন। আপনার মনে আমাদের কথায় অবিশ্বাস জন্মিতে পারে। থানাদার এখন বেঙ্গল পুলিসের ইনস্পেকটর তো? এত টাকা তিনি কোথা হইতে উপায় করিলেন? কিন্তু আপনি চোখ বুজিয়া পড়িয়া যান, আমাদের কথায় কিছুমাত্র মিথ্যা নাই, বিশুদ্ধ সত্য! একথা সকলেই জানেন যে একজন ডেপুটি গোবিন্দ পণ্ডা নামক এক ব্রাহ্মণকে মোকদ্দমায় ডিক্রি দেওয়াতে পণ্ডা মহাশয় আশীর্বাদ করিলেন, 'ডেপুটিবাবু, তুমি

দারোগা হও।' আপনি ব্যাপারটা বুঝিলেন তো? বুদ্ধিমান্ লোকে ইঙ্গিতেই সব বুঝিয়া ফেলেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী মতি শীল প্রথমে খালি বোতল বিক্রি করিতেন। একজন শুঁড়ি বড় দুঃখে বলিয়াছিল, 'মতি শীল খালি বোত্‌ল বেচে ক্রোরপতি, আমি ভরা বোতল বেচে কাঙাল।' আমাদের ভয় কোনও বি-এ, এম্-এ পাস বাবু আলিমিঞার কথা শুনিয়া শুঁড়ির ন্যায় বিলাপ করিবেন, 'হায় হায়, মিঞা উল্টো কলমে কেবল নামটি সই করে জমিদার, আমরা সোজা কলমে লম্বা লম্বা "এসে" লিখেও খেতে পাই না।' কথাটি জানেন, ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।

আলিমিঞার একটি মাত্র পুত্র, নাম শেখ দিলদারমিঞা ওরফে ছোটা মিঞা। পুত্রকে লায়েক ও এলেমদার করিবার জন্য দারোগা সাহেবের কিছু মাত্র গাফিলতি ছিল না। পারসী পড়াইবার জন্য বহুদিন বাড়িতে মৌলবী নিযুক্ত ছিল। ছোটামিঞা পনের বৎসরের মধ্যে পারস্য ভাষায় বিলকুল বর্ণমালা ও বানান শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। ছোটামিঞার বাইশ বৎসর পুরিয়া গিয়াছে, এখন মৌলবী সাহেবের সামনে বসিয়া দুলিয়া দুলিয়া কেতাব পড়িলে লোকে কি বলিবে? আবার দোস্তরা আসিয়া অকারণে বসিয়া থাকে, তাহাদের কষ্ট দেখা মিঞার বরদাস্ত হইতেছিল না। বিশেষতঃ মৌলবীসাহেব কখনও কখনও বলেন, 'নিশা খানেসে আদমি জানুঅর হো যাতা হ্যায়।' একথা নিহায়ৎ বেবরদাস্ত।

একদিন বিকালে মৌলবী সাহেব খানা খাইয়া চিত হইয়া শুইয়া আছেন। জেলেরা তাগা কাটিবার জন্য যেমন করিয়া শনের নুড়ি মেলিয়া দেয় সেইরূপ একরাশ পাকা দাড়ি মিঞাসাহেবের গলা ও বুক ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, এমনি সময় একটা জ্বলন্ত টিকা দাড়ির মধ্যে পড়িয়া পড়্ পড়্ করিয়া পুড়িয়া বুকে লাগাতে মৌলবীসাহেব ধড় মড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া 'তোবা তোবা' বলিয়া দাড়ি ঝাড়িতে লাগিলেন। টিকাটি ভাঙ্গিয়া গিয়া আগুনের ফুলকি কাপড় চোপড়ে ছড়াইয়া পড়িল। পাকা দাড়িগুলি ফুলঝুরির মত চারিদিকে উড়িতে লাগিল। 'আহ্ মেরি তোবা তোবা রে, আহ্ মেরি তোবা রে', বলিয়া মিঞা ঘরময় লাফালাফি করিয়া আগুন নিবাইতে লাগিলেন। লঙ্কা পোড়াইবার সময় হনুমানের মুখে আগুন লাগিয়া কিরকম দেখাইতেছিল মহর্ষি বাল্মীকি সেকথা খুলিয়া লিখেন নাই, তাই আমরা উপমাস্থলে সে কথার উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া বিবেচনা করি। সর্বনাশং সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। মৌলবী সাহেব এই শাস্ত্রনীতি অনুসারে অর্ধেক দাড়ি রক্ষাপূর্বক

'বিস্‌মিল্লা, বিস্‌মিল্লা' বলিয়া সেদিন রাত্রে ঘরের কবাট বন্ধ করিয়া রহিলেন, তার পরদিন সকাল হইতে তাঁহাকে কেহ মেদিনীপুরের মধ্যে দেখে নাই। আলিমিঞার কানে একথা যাওয়ায় তিনি বলিলেন, 'কুছ পরোআ নেহি, মেরি দিলু তো ইল্‌ম্‌ হাসল করে লিয়েছে—হামি কেবল হামার নাম লিখতে জানি, এত দৌলত কামালাম, মেরি দিলু তো বহুৎ শিখেছে; সেদিন আমার সামনে ইম্‌তান দিল নিজের নাম লিখল, কল-কত্তা মেদিনীপুর, হাতী ঘোড়া, বাঘ বাগিচা কত কথা লিখে গেল। বড়া সাহেব খবর পেলে এখনি ওকে দারোগাগিরি দেবে, কিন্তু আমি একথা লুকিয়েছি, আমি দিলুকে চাকরি করতে দেব না। ও ছেলেমানুষ, এত মেহনৎ করতে পারবে না।' অতঃপর আলিমিঞা লেড়কাকে কাছে বসাইয়া বিষয়কর্ম চালানো সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। বিশেষ করিয়া ওড়িশার জমিদারি সম্বন্ধে বহু হুঁশিয়ারির উপদেশ দিয়া বলিলেন, 'দেখ, সে দেশে যে মহান্তিরা আছে তারা বড় জুয়াচোর। আমি হিসাব কেতাবে খুব মজবুত বলে আমাকে ঠকাতে পারে নি। তাদের জুয়াচুরির কথা শুনবে? এক দুই তিন আর চার, এই দুনিয়ার হিসাব; কিন্তু তাদের হিসাব কি জান? এককেক্কে এক, দুয়েক্কে দুই, দুই দুগুণে চার। দেখ, এক দুই চার হল, বিচ্‌মে তিন্‌ কাঁহা গিয়া? এহি তিন রুপেয়া চোরি।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

জমিদার বংশের পরিচয়ের জন্য এতগুলো কথা লিখিতে হইল, কিন্তু ইহা সবই পুরানো কথা। আজ পাঁচ বৎসর হইল শেখ কেরামৎ আলি ফৌত হইয়া গিয়াছেন।

ছোটামিঞা ওরফে শেখ দিলদার এখন খোদ মালিক। রাত্রি আন্দাজ এক ঘড়ি, শেখ দিলদারমিঞা কাছারি ঘরে বসিয়া আছেন। ঘরটি পাকা, যেমন তেমন একখানি ছোট কুঠরি নয়। রীতিমত লম্বা চওড়া ঘর। ঘরে ফরাশ পাতা রহিয়াছে। সেটা বোধ হয় বড় পুরানো, দশ বার জায়গায় তেল লাগার দাগ, টিকার আগুনে পোড়া জায়গাও পনের-কুড়িটি, পাড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সেই ফরাশের মাঝখানে দেওয়ালের কোলে একটি বেনারসী বিছানা, দেওয়ালে ঠেসানো বড় একটা বেনারসী তাকিয়া, দুইপাশে ঢাকা কুমড়ার মত দুইটা ছোট বেনারসী তাকিয়া। সেই বিছানায় খোদ জমিদার শেখ দিলদারমিঞা বসিয়া আছেন। পোশাক কিংখাবের ঢিলা পাজামা, সাটিনের চাপকান, মাথায় বেনারসী টুপি; কানে আতর লাগানো তুলা গোঁজা, সামনে রুপার আতরদান, গোলাবদান, তাহার কাছে বড় এক সাত হাত নলযুক্ত গড়গড়া, তাহার উপরে একটি

ছোট হাঁড়ির মত কলিকা, তাহার উপর সরপোশ তাহা হইতে চারি সারি রুপার শিকলি ঝুলিয়া ভূমিস্পর্শ করিয়াছে। শিবের কাছে রোগী যেমন ধন্না দেয় তেমনি করিয়া নলটা মিঞার পাদস্পর্শ করিয়া পড়িয়া আছে, আজ তাহার আদর নাই। চক্রনেমি ক্রমেন মনুষ্যের ন্যায় অচেতন পদার্থেরও ভাগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। ঘরের কোণ ও এদিকে ওদিকে ছেঁড়া ঝাঁটা, জলপূর্ণ বদনা, দুই চারিটা গুলি খাইবার নলিচা, তামাকের গুল, গুলি ও গাঁজার ছাই, পেঁয়াজের খোসা, ছাগলের নাদি প্রভৃতি আবশ্যক ও বর্জিত পদার্থসকল পড়িয়া আছে। এ সকলের মধ্যে আবার পানের পিক ও পানের ছিবড়াই বেশী। আমরা স্বকীয় বুদ্ধির প্রাখর্য-দ্বারা বুঝিয়াছি এ ঘরের মধ্যে কখনও কখনও ঝাঁট পড়ে নহিলে কোণে এত জঞ্জাল কোথা হইতে জমিল? ঘরের উপর দিক ভাঙ্গা। উকিলরা যেমন আয়না লাগানো আলমারিতে দপ্তর গুছাইয়া রাখিয়া তাকিয়ায় হেলান দিয়া মক্কেলের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকেন তেমনি করিয়া কার্ণিসগুলিতে মাকড়সা জাল টাঙ্গাইয়া মশাটি মাছিটির দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। বড় ফাঁকগুলিতে চড়াই পাখির মজলিস্। সেই মজলিস্ হইতে সময়ে অসময়ে এক-আধটা কাঠিকুটা ঝরিয়া পড়িতেছে। নিচেকার মজলিস্ আজ নিস্তব্ধ। মিঞাসাহেব গালে হাত দিয়া গুম হইয়া বসিয়া আছেন। ওয়াটার্লু যুদ্ধে হারিয়া নেপোলিয়ন ভাবনায় পড়িয়া এমন ভাবে বসিয়া থাকিতে পারেন নাই, কারণ সেণ্টহেলেনায় পাঠাইবার জন্য ইংরেজেরা তাঁহাকে ধরপাকড় করিতেছিলেন। সম্মুখে সাতজন মোসাহেব বসিয়া ভাবনায় ঢুলিতেছেন। ওস্তাদজি বকাউল্লা খাঁ নিজের দুইটি পা জড়াইয়া ধরিয়া দাড়িটিকে হাঁটুর উপরে চাপাইয়া বসিয়া আছেন। মুসলমানের তালাক দেওয়া স্ত্রীলোকের মত তানপুরাটা ও পরিত্যক্ত হাঁড়ির মত তবলা দুইটা পড়িয়া গড়াইতেছে ঘরের এক কোণে। খিদমতগার ফতুআ বাঁ হাতে কি একটা পদার্থ রাখিয়া ডান হাতের বুড়া আঙ্গুলে টিপিতেছে, মাঝে মাঝে মাঝের আঙ্গুলে ফোঁটা ফোঁটা জল দিতেছে। মুনশী জাহের বক্স্ একটুকরা কাগজে লেখা ফর্দ লইয়া ডেপুটির সামনে চোর আসামীর মত দাঁড়াইয়া আছেন।

মিঞা সাহেব চোখ বুজিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'এখন উপায় কি?' মুনশী সাহেব বলিলেন, 'বন্দে নওয়াজ্, আমি সারাদিন ঘুরেছি, কোথাও কিছু সুবিধা হল না। মহাজন রামদাস বলল তার তমসুক বাবত কুড়ি হাজার ও খুচরা হাওলাত বাবত চার হাজার টাকা হয়েছে, আর কর্জ দিতে সে রাজি হল না। বাজারের

মুদি ও দোকানদারদের পাওনা চার হাজার, তারা ধারে সওদা দিল না।' মিঞা বলিলেন, 'বেকুব, কম্‌বক্ত্‌, নালায়েক—বাবার আমল হতে রাম সরকার বিশ বছর ধরে আমাদের চাকরি করেছিল, তাকে বার করে তুমি দোস্ত ও লায়েক মানুষ বলে তোমাকে সরকার বহাল করলাম, গরজ চালাতে পার না!' মুনশীজাহের বকস্‌ বলিলেন, 'হুজুর, আমি কি করে নালায়েক হলাম? রাম সরকার কিছু কর্জ আনতে পারছিল না, আমি পাঁচ বছরের মধ্যে পঁচিশ হাজার কর্জ এনে দিলাম।' মিঞা বলিলেন, 'সে কথা যেতে দাও, এখন ইজ্জৎ কি করে থাকে? "যাক ধন থাক মান, মান গেলে না মিলে আন।"' মোসাহেবরা ঢুলিতেছিল, একথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে একযোগে বলিল, 'আলবাৎ, আলবাৎ, ওআজিব ওআজিব।' মিঞা বলিলেন, 'যাও, ঘরের আসবাব হউক বা জমিদারি হউক, বন্ধক দিয়ে আজকার মজলিসের বন্দোবস্ত কর। দেখ—জল্‌দি, রাত হয়ে গেল। বেশী টাকার দরকার নেই। বাইজীর মুজরার দরুণ একশ' টাকা ও তার লোকজনের খানা-পলাউয়ের জন্য একশ টাকা যথেষ্ট।' দোস্তরা বলিল, 'ওআজিব ওআজিব। বহুৎ রুপিয়ার দরকার কি?' দোস্ত হনুমিঞা বলিল, 'হুজুর এই যে খেমটাওয়ালী খাতুন উন্নিসা এসেছেন তিনি ভারী এলেমবাজ। কাশ্মীরের পয়লা নম্বর বাই, তাঁর এলেম ও রাগ-রাগিণীর কৎসরৎ হদ্দের হদ্দ। তিনি কি এ মুলুক পছন্দ করেন? কেবল মুসাফের হয়ে এসেছেন। মুর্শিদাবাদের নবাব লখ্‌নৌয়ের নবাব রুমের বাদশা সামের বাদশারা এ'র গান শুনবার জন্য ডেকে পাঠান কিন্তু বিধি খাতিরনাদারদ। হুজুরের নেকনাম দুনিয়ায় জাহির, সেইজন্য আপনি এসে এখানে মজলিস্‌ করতে চান।' মজলিসের সকলে এক সঙ্গে বলিল, 'হুজুরকে দুনিয়ায় কে না জানে? হুজুরের খানা পোলাও যে একবার খেয়েছে সে জিন্দিগিভর ইয়াদ রাখবে।'

পেয়াদা শেখ ফজু সেলাম করিয়া জানাইল, 'হুজুর, ওড়িশার জমিদারি হতে এক মহাজন মুলাকাৎ করতে এসেছেন।' হুকুম হইল, তাহাকে হাজির কর। আগন্তুক উপস্থিত হইয়া আগে নগদ পাঁচ টাকা নজরানা দিয়া ভূমিস্পর্শপূর্বক তিনবার সেলাম করিলেন। মজলিসে যত জন বসিয়াছিলেন সকলকে এক একবার সেলাম করিলেন, খিদমতগারও বাদ গেল না। মিঞা হুকুম করিলেন, 'বহুৎ কদরদান আদিম্‌।' অমনি সকলেই ধুয়া ধরিল, 'বহুৎ কদরদান, বহুৎ হুশিয়ার আদিম্‌।'

মিঞা জিজ্ঞাসিলেন, 'তোমার নাম কি?'

—'রামচন্দ্র মঙ্গরাজ।'

—'কেয়া? রামচন্দর্ মামলাবাজ্?'

—'না হুজুর, মঙ্গরাজ।'

—'আচ্ছা, ওই হুয়া, রামচন্দর্ মঙ্গোরাজ।'

মঙ্গরাজ জানাইলেন, 'আমি নেহাত সামান্য কিছু জিনিস নজর এনেছি। হুকুম হলে হাজির করব।' 'বহুৎ আচ্ছা, হাজির কর।' ভেটের ফর্দ একখানা তালপাতায় লেখা ছিল। পড়া হইল—পাঁচটা ধামায় সরু আতপ চাল এক ভরণ আট নউতি*, মুগ দুই ধামায় বত্রিশ নউতি, অড়হর এক ধামায় আঠার নউতি, ঘি এক কলসীতে পঁচিশ সের, কাঁচকলা দুই জাতের পাঁচ কাঁদি, পাকা কলা দুই কাঁদি, আলু আট বিশা।†

মিঞা হুকুম করিলেন, 'বহুৎ আচ্ছা, চাল পোলাওয়ের লায়েক, ঘিও বহুৎ ভাল।' মঙ্গরাজ বলিলেন, 'হুজুর আমাদের দুনিয়ার মালিক, হুজুরের দানা চৌদ্দপুরুষ ধরে খেয়ে আসছি, এ তো সামান্য জিনিস, মেহেরবানি হলে পোলাওয়ের চাল, ঘি, ডাল বরাবর হাজির করব।' মেয়াঁও মে—য়াঁ—ও মে—য়াঁ—ও ওস্তাদজী বড় খুশী হইয়া তানপুরার কান বাঁ হাতে মলিয়া সুর ছাড়িলেন। গুম্ গুম্ গুম্ তাক্ ধিন্ ধিন্ ধিন তাক্ ধিন ধিন্ গুম—তবলা বাজিয়া উঠিল। মিঞা হুকুম দিলেন, 'জলদি পোলাওয়ের বন্দোবস্ত কর।' খ্রীষ্টানেরা বলেন পৃথিবীর শেষ দিনে স্বর্গের দূত বাঁশী বাজাইলে যত লোক মরিয়াছে সকলে কবর হইতে উঠিয়া আসিবে। মজলিস মরিয়া পড়িয়াছিল, মঙ্গ-রাজের টাকার ঝন ঝন শব্দে বাঁচিয়া উঠিল। মিঞা সাহেব ফরসির নলটি মুখে দিয়া ভাল করিয়া দুই চার টান দিলেন। কালো পাহাড়ের গায়ে কুয়াশার মত তাঁহার সারা দাড়িতে ধুঁয়া খেলিয়া গেল। সরকার কেনাল দ্বারা যেমন পরগনায় পরগনায় জল বাঁটিয়া দিতেছেন নলযোগে হুঁকার ভিতরকার ধুঁয়া সেইরূপে সকলের মুখে মুখে গিয়া পৌঁছিল। মেয়াঁও—মেয়াঁও। পোলাওয়ের জন্য একটা খাসি আনা হইল। মজলিসের সামনে দাম ঠিক হইল—আড়াই টাকা। মঙ্গরাজ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'কি, এই পাঁঠার দাম আড়াই টাকা? বাপরে কি দাম!' মিঞা শুধাইলেন, 'তোমাদের গ্রামে কিরকম দাম?' ডাক্তার যেমন করিয়া রোগী পরীক্ষা

* ৮০ নউতি বা গউনী=১ ভরণ।

† বিশ্বা॥ এক পাল্লাওয়ালা একপ্রকার তরাজু, তাহার দণ্ডের একদিক সরু অন্য দিক মোটা, সরু দিকে পাল্লা ঝোলানো থাকে। ইহাতে এক সঙ্গে যতখানি মাল ওজন করা যায় তাহাকেও বিশ্বা বলে।

করেন মঙগরাজ তেমনি করিয়া ছাগলটির অগ্র পশ্চাৎ, দক্ষিণ বাম উত্তম-রূপে নিরীক্ষণপূর্বক বলিলেন, 'এ পাঁঠার দাম আর কত? চার পয়সা কি ছয় পয়সা হবে, হুকুম হলে পোলাওয়ের জন্য দশ গণ্ডা কি পনের গণ্ডা পাঠিয়ে দিতে পারি। হুজুর লোক চিনে জমিদারিতে চাকর রাখেন নি তাই এত টাকা বরবাদ। আড়াই টাকা একটা পাঁঠা? বাপরে।' এ কথা শুনিয়া মজলিসে যে কিরূপ আনন্দ কোলাহল উঠিল তাহা বর্ণনাতীত। ক্লাইভ সাহেবের পলাশীর যুদ্ধ জয়ের সংবাদে বিলাতে ডাইরেক্টার সভা নিশ্চয় এতদূর আনন্দিত হন নাই। কারণ সে সময়ে দিল্লীর দরবারের ভয় তাঁহাদের মন হইতে যায় নাই। ওস্তাদজী পুরিয়া রাগিণীর আলাপ করিতে লাগিলেন। সকলে আনন্দে উন্মত্ত, সকলের মুখে হাসি উথলিয়া পড়িতেছে, কেবল মঙগরাজ হাত জোড় করিয়া মুখ শুকাইয়া বসিয়া আছেন। জালের বেড়ের মধ্যে ছড়ানো চাল খাইবার সময় পাখিদের আনন্দ ব্যাধ চুপ করিয়া দেখিতে থাকে। আমরা মঙগ-রাজের মনের কথা ভাল বুঝিতে পারি। বোধ হয় সে সময়ে মনে ভাবিতেছিলেন, 'আয় বাবা পাখি আয়, আঠা-কাঠির কাছে আয়।'

একজন চাকর ছুটিয়া আসিয়া বাইজীর শুভাগমন সংবাদ দিল। যাঃ সর্বনাশ! এ কথা তো কাহারও মনে নাই। ওস্তাদজী পুরানো হুশিয়ার লোক, তিনিই কেবল মনে করাইয়া দিলেন, বাইজীকে একশ টাকা নজরানা দিতে হইবে। আবার ভাবনা আবার আলোচনা। ভারতবর্ষের ব্যয়-সংকলনের জন্য পার্লামেণ্টে বোধ হয় ইহার চাইতে বেশী আলোচনা হয় নাই। কিছুই স্থির হইল না; সময় নাই। সুযোগ বুঝিয়া মঙগরাজ জোড়হাতে বলিলেন, 'হুজুর, গোলাম হাজির থাকতে এত চিন্তা কিজন্য?' পুনরপি সকলের মুখ হইতে প্রশংসা ধন্যবাদ মঙগরাজের কানে বর্ষিত হইল। মিঞা হুকুম দিলেন, 'আচ্ছা মঙগরাজ তুমি এখন যে উপকার করলে তার ইনাম আলাদা পাবে, তা ছাড়া টাকায় সুদ চার আনা হিসাবে পাবে।' মঙগরাজ বলিলেন, 'রাম রাম রাম! হুজুর আমি পিঁয়াজ ও বিয়াজ* খাই না।' ওস্তাদজী বলিলেন, 'অ্যাঁ বিয়াজ খায় না? বহুৎ ইমানদার লোক। কোরাণে যে পঁচিশ হারাম বয়ান আছে বিয়াজ তার একটি।'

ইতিহাস লেখক বলেন ক্লাইভ সাহেবের দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে বাংলার সুবাদারি নিতে এত অল্প সময় লাগিয়াছিল যে একটা গাধা কেনাবেচাতেও তাহা অপেক্ষা বেশী সময় দরকার। তবে ফতেপুর সরষণ্ডের সরবরাহকারি ও সমস্ত ক্ষমতা পাইতে মঙ্গরাজের পক্ষে আর বিলম্ব কিসের?

* বিয়াজ ॥ ব্যাজ, সুদ।

৯ ॥ গ্রামের হালচাল

তালুক ফতেপুর সরষণ্ড একটি ভারী বড় তালুক। সদরজমা পাঁচ হাজার দুইশ আট টাকা ছয় আনা, মফস্বল উসুল আড়াই গুণ। উপরি ছাড়িয়া দাও। ইহাতে পাঁচটি মৌজা—রামনগর, বালিআ, হাণ্ডিখাই, মউতুনিআ ও গোবিন্দপুর। গোবিন্দপুর সব চাইতে বড়, প্রায় পাঁচশ ঘর বসতি, সব জাতির লোক আছে। একটা দোকান আছে। সে দোকানে সব জিনিস পাওয়া যায়—চাল, ডাল, তামাকপাতা, নুন, তেল যাহা চাও পাইবে, দুই চারি পয়সার ঘি চাও তো তাহাও মিলিতে পারে।

দোকানে তিন পুরুষের পুরাতন দশমূল সঞ্চিত আছে, দুই তিন ক্রোশ দূর হইতে বৈদ্যদের ফর্দ আসে। গ্রামটি লম্বালম্বি কিন্তু সোজা নয়, মাঝে বাঁক আছে, অসুর দীঘির উত্তর ও পশ্চিম দিকের অর্ধেক লইয়া গ্রামখানি রহিয়াছে। মাঝখানে পথ, দুইদিকে ঘরের সারি। এই দুই সারি ঘরের মাঝে জায়গা অনেকখানি থাকিলেও যাওয়া আসা করিবার পথটুকু দশ বার হাতের বেশী চওড়া নহে। পথের দুই পাশে প্রত্যেকের ঘরের দুয়ারের সামনে গোবরের খাত, খানিকটা করিয়া খালি জায়গা আছে, সকালে সেখানে গাই বলদ বাঁধা হয়। কোথাও কোথাও এক একটা গরুর গাড়ি রহিয়াছে। পথ হইতে প্রত্যেকের ঘরে গিয়া উঠিবার আলাদা আলাদা রাস্তা। গ্রামটি তিন ভাগে বিভক্ত—জমিদারপাড়া, তাঁতীপাড়া, আর ব্রাহ্মণপাড়া।

জমিদারপাড়ায় খোদ জমিদার রামচন্দ্র মঙ্গরাজের বাড়ি। এই জন্য খুব নামডাক। রাত্রি ছয় ঘড়ি পর্যন্ত কাছারি বসে। দোকানটাও এই পাড়াতেই। অন্য পাড়ায় এক প্রহর রাত হইলেই সব চুপচাপ।

ব্রাহ্মণপাড়ার আসল নাম শাসন। পঞ্চাশটি ভাগ, বাপভাইয়ের বাহাত্তর ঘর। পথের দুইপাশে দেড়শ আন্দাজ নারিকেল গাছ। শেষ মুড়ায় বড় করিয়া বাঁধান বেদী, সেখানে বলদেবের পূজা হয়। বেদী হইতে দশ পনের হাত তফাতে কতকগুলি চারামত নারিকেল গাছ, তলা পরিষ্কার তক্‌তকে। সেখানে গোসাঁইদের বৈঠক বসে। নস্যি শুঁকা, সিদ্ধি ঘুঁটা, যজমান ঘরের কথা, প্রাপ্তি দক্ষিণার কথা, অন্যান্য লোকের কথা ইত্যাদি সব কথার সেইখানে ফয়সালা হয়। এক একদিন সেখানে বড় গোলমাল হয়, সেদিন যে যজমানের ঘর হইতে পাওয়া শ্রাদ্ধের চাল

বা সভার দক্ষিণা ভাগ বাটোয়ারা হইতেছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। সে ঝগড়া শুনিয়া লোকেরা বলে, 'বামুনগুলো এক মুঠো চালের জন্য কুকুরের মত ঝগড়া করছে।' কিন্তু লোকেদের এরূপ কথা আমাদের কিছু ভাল লাগে না। তাহার কারণ, ইঁহারা আকাট মূর্খ। অলস ব্রাহ্মণ কর্মহীন হইলেও ছত্রিশ বর্ণের রাজা তো বটে। ইঁহাদের কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা কখনই উচিত নহে। উপমাটাও ভাল হইল না। কারণ প্রেতের উদ্দেশে উৎসৃষ্ট ভিজা চালের জন্য ব্রাহ্মণদিগের ঝগড়া। আর কুকুরের ঝগড়া এঁটো ভাতের জন্য। দেখুন প্রেতের উচ্ছিষ্ট ভিজা চাল আর মানুষের উচ্ছিষ্ট সিদ্ধ করা চাল, কত প্রভেদ। তা ছাড়া কুকুরেরা কামড়া কামড়ি করে। ব্রাহ্মণরা মারামারি করেন বটে কিন্তু একজন ব্রাহ্মণকে আর-একজনকে কামড়াইয়া বা আঁচড়াইয়া দিতে দেখা যায় না। আকাশে শকুন উড়িলে কোথাও না কোথাও মড়া পড়িয়া আছে যেমন বুঝা যায়, তেমনি এক প্রহর বেলায় গোসাঁইরা কপালে ফোঁটা কাটিয়া পৈতা গলায় দলে দলে বাহির হইলে কোনও গাঁয়ে মানুষ মরিয়াছে বলিয়া লোকে অনুমান করিয়া লয়।

পাণিগ্রাহীর ভাগের এক বাটি জমি লইয়া শাসনের ভাগের জমি পাঁচশ মাণ বা পঁচিশ বাটি। ত্রিসন্ধ্যায় আশীর্বাদ করিয়া জমি ভোগ-দখল করিবার জন্য মারাঠী সুবাদার তাম্রফলকে সনন্দ লিখিয়া দিয়াছেন। ত্রিসন্ধ্যা অর্থাৎ ত্রিকাল সন্ধ্যা। ত্রিকাল অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান। ভূতের কথা ভূতেই জানে, ভবিষ্যতের কথা কোনও মানুষ জানে না, বর্তমানের কথা আমরা জানি। গাই গরু খুঁজিয়া আনিয়া বাঁধিতে, গোয়াল ঘরে সাঁজাল দিতে, ক্ষেতমজুরদের পান্তা দিতে সন্ধ্যাবেলাটা কাটিয়া যায়। ভূমিদাতাকে আশীর্বাদ করিবেন কখন? এই কথা হইতে হইতে একদিন ভোবনি বাহিনীপতি বলিয়া বসিলেন, 'আমাদের জমি কোথায় যে আমরা সন্ধ্যায় আশীর্বাদ করব?' কথাটা নেহাত মিথ্যাও নয়, শাসনের ভাগের পাঁচশ মাণের মধ্যে দশ বৎসরের ভিতর চারশ মাণ বিক্রি করা হইয়া গিয়াছে। বাকী যে কয়মান জমি তাহা মঙ্গরাজ সামলাইয়াছেন বলিয়া রহিয়াছে। 'গো ব্রাহ্মণহিতায় চ' মঙ্গরাজের ভারী যত্ন। যে সকল গরু ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের বড় সাবধানতার সহিত মঙ্গরাজ আপন গোঠে নিয়া রাখেন, কোন কোন পাণ*-অ এরূপ কোনও বেওয়ারিস গরু আনিয়া বকশিশ নিতে সচরাচর দেখা যায়।

* পাণ॥ (উচ্চারণ অ-কারান্ত) ওড়িশার হরিজন জাতিবিশেষ, পূর্বে অস্পৃশ্য।

বলদ বাদে কেবল গাই সংখ্যায় তিনশর বেশী হইয়া গিয়াছে। গোমাতো এখানে সেখানে ঘুরিয়া কষ্ট পাইবেন, সেইজন্য মঙ্গরাজ সামলাইয়াছেন। নেহাত বেশী হইয়া গেলে বছরে বছরে মুসলমান গোয়ালাকে আধাআধি দিতে হয়। সেইরূপ ব্রাহ্মণদিগের জমিগুলি কিনিয়া লইয়াছেন, সামলইয়া রাখিয়াছেন। গোসাঁইরা জমি বিক্রি না করিয়া কি করিবে? এক তো বামনাই চাষ, তা ছাড়া চোরেরা বাছিয়া বাছিয়া ব্রাহ্মণদের জমি হইতেই ধান চুরি করে। মঙ্গরাজকে কিছু জমি বিক্রয় করিয়া দিলে চোরেরা ভয়ে ধারে কাছে আসে না। আর মঙ্গরাজ পাঁচ পাঁচ টাকায় পাঁচ মাণ জমি কিনিলেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন। এটা তাহাদের বুঝিবার ভুল। আচ্ছা, তুমি এক ভরণ ধান বুনিলে পাঁচ ভরণ কাটতো? মঙ্গরাজের টাকাটাই কি বাঁজা?

শাসনের মাঝখানে শিবু পণ্ডিতের ঘর। ইঁহার ঠাকুরদাদা বিকি খাড়ঙ্গা পুরা সাত পাদ ব্যাকরণ মুখে মুখে বলিয়া যাইতে পারিতেন এমন কথা পণ্ডিতদের মুখে শুনা যায়। নৈষধান্ত পাঠও তাঁহার আটকাইত না। কোকিল যেমন গান গায় তেমনি পণ্ডিত মহাশয়ের পিতা ব্যাকরণের শব্দ ও সন্ধি হাঁকিয়া যাইতেন। তাঁহাদের পুথিগুলি বৈঠকের উপর শালগ্রামশিলা ও ভাগবত গ্রন্থাদির সহিত সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। পণ্ডিত মহাশয় রোজ সেইগুলি পূজা করেন। পণ্ডিত মহাশয় নিজেও জবর পণ্ডিত। পুথির ডোর না খুলিয়াই অমরকোষের পাঁচ অধ্যায় বলিয়া যাইতে পারেন। পণ্ডিত মহাশয়ের ঠাকুরদার মামাত ভাইয়ের ভগ্নীপতির মাসতুত ভাই নবদ্বীপ গিয়া ন্যায়শাস্ত্র পড়িয়া আসিয়াছিলেন। মোট কথা খাড়ঙ্গা বংশের জন্যই শাসনে বিদ্যা বজায় রহিয়াছে। তাঁহার বারান্দায় চৌপাড়ি, শাসনের ছেলেরা দুইবেলা পড়ে, একচল্লিশ কর্ম কর্মাঙ্গ ষোল আনাই সেখানে অধ্যাপনা হয়। কোনও কোনও ছেলে অমরকোষের এক অধ্যায় বা দুই অধ্যায় পর্যন্ত উচ্চশিক্ষাও লাভ করে।

পশ্চিম সারে তাঁতীপাড়ায় তাঁতী দেড়শ ঘর, এই পাড়ার পথটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; গোবরের খাত গোবরের গাদা কিছুই নাই। আপনি ভাবিতেছে সেখানে পাঁচ আইন জারি আছে, মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি আসিয়া জঞ্জাল উঠাইয়া নিয়া যায়। আপনাদের সাবধান করিয়া দিতেছি আমাদের কাছ হইতে না শুনিয়া কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন না। অনেক অনুসন্ধান, অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আমাদের লিখিতে হয়। আপনাদের এইরূপ ভ্রম অপনোদনের জন্য আমাদের এত পরিশ্রম, নয়তো কিসের প্রয়োজন? আবার যাতা কতকগুলা লিখিয়া ফেলা

আমাদের অভ্যাসের বিপরীত। অকাট্য প্রমাণ না পাইলে কিংবা যাহা ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত নহে এমন কথায় আমরা কান দিই না। যাহা লিখিব তাহা ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে প্রমাণ করিয়া দিব, আপনার আর কিছু বলিবার থাকিবে না। এই দেখুন, প্রমাণ প্রয়োগের জন্য ন্যায়শাস্ত্র বলেন, 'পর্বতো বহ্নিমাণঃ ধূমাৎ', অর্থাৎ পর্বত হইতে ধুঁয়া বাহির হইতেছে। কেন? না, ভিতরে আগুন আছে। মহানদীর জলে বান ডাকিতেছে। দেখিলে বুঝিবে উপরে প্রবল বর্ষা হইয়া গিয়াছে। কার্যকারণের এইরূপ একটা নিত্য সম্বন্ধ আছে। 'ন কার্যং কারণং বিনা', কারণ না থাকিলে কার্য হয় না। এখানে নদী-বৃদ্ধির কারণ হইল বৃষ্টি। সেইরূপ আমরা অকাট্য যুক্তি দেখাইয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারি যে গোবরের সহিত গরুর নিত্য সম্বন্ধ আছে। কারণের অভাব হইলে কার্যের অভাব হইবে এ কথা আপনি অবশ্য স্বীকার করিবেন। সুতরাং তাঁতীপাড়ার গোবর গাদার অভাবের কারণ গরুর অভাব, অর্থাৎ তাঁতীপাড়ায় গরু নাই, সুতরাং গোবর নাই। আপনাদের মনে আর-একটা ভারী খটকা লাগিতে পারে। গরু-গুলা বাঘ-ভালুক নয় যে বনে থাকিবে; তাহারা গৃহপালিত, গ্রামে থাকা তাহাদের স্বভাব। যেখানেই জল সেখানেই মাছ; যেমন গ্রামে গ্রাম্যপশু, এটা ধরাবাঁধা কথা। তাঁতীপাড়া একটা গ্রাম, তাহা হইলে গ্রাম্যপশু নাই কেন? আমরা পরমেশ্বরের সৃষ্টি কৌশলে অনেক ব্যতিক্রম দেখিতে পাই, হয় কাজে গাফিলতি করিয়াছেন নয় তো ঢিলা দিয়াছেন। যেমন দেখুন, পশু বল, পক্ষী বল, কীট বল, পতঙ্গ বল সব জাতিতেই মাদী ও মদ্দ আছে, তাহাদের মধ্যে তো এক-একটা হিজড়াও দেখা যায়। তেমনি তাঁতী-পাড়া গ্রাম হইলেও তাহাতে গ্রাম্যপশু নাই। পশু সম্পর্কে সেটা হিজড়া অর্থাৎ সেখানে বন্যপশু বাঘ-ভালুক কিংবা গ্রাম্যপশু গাইগরু কিছু নাই তাহারও কারণ থাকিতে পারে। কারণ বিনা কার্য নাই ইহা ন্যায়-শাস্ত্রের সূত্র। ব্যাকরণবিদগণ সূত্র করিতে না পারিলে নিপাতনে সিদ্ধ বলিয়া একটা কথা বলিয়া কাজ সারিয়া দেন। কিন্তু তাহা একপ্রকার ধাপ্পাবাজি। আমাদের দ্বারা তাহা হইবে না। সে কথা থাক, তাঁতী-পাড়ায় গরু কেন নাই তাহার কারণ বলিতেছি।

বাইবেলে লেখা আছে একজন সেবক দুইজন মনিবের সেবা করিতে পারে না। সচরাচর দেখা যায় শাস্ত্রকারগণ ইহাও ঠিক উহাও ঠিক বলিয়া কাজ সারিয়া দেন। টীকাকার ছাড়া মূল গ্রন্থ বোঝা নিতান্ত কঠিন। মল্লীনাথ, মথুরানাথ, শ্রীধর ব্যাখ্যা করিয়া না দিলে রঘুবংশ, ন্যায়, ভাগবতের মত গ্রন্থগুলি আজ পর্যন্ত ডোরবাঁধা হইয়া পড়িয়া থাকিত।

সেইরূপ আমরা বাইবেলের ব্যাখ্যা করিয়া না দিলে বোঝা সহজ নহে। আপনি না হয় টানিয়া টুনিয়া একরকম মানে করিয়া লইবেন, কিন্তু সকলে তো সব কাজ পারে না। বাইবেলের সূত্রের অর্থ হইতেছে একজন মানুষ এক সঙ্গে দুই কাজ পারে না। অর্থাৎ কাপড় বোনায় তাঁতীদের দিন যায়, চাষ করিবার সময় কই? চাষ যদি না করিলে বলদ রাখিবার দরকার কি? বলদ না থাকিলে গোবর কোথা হইতে আসিবে? গোবর অভাবে গোবরের খাতের অভাব। গোবরের খাত না থাকায় ঘরের বাহির পরিষ্কার।

এই উনিশ শ সংবৎসরে বিজ্ঞানশাস্ত্রের খুব মর্যাদা। কারণ এই শাস্ত্র সকল উন্নতির মূল। দেখুন ইংরেজরা কত ফরসা আর ওড়িয়াদের রং কাল। তাহার কারণ ইংরাজেরা বিজ্ঞানশাস্ত্র পড়িয়াছেন, ওড়িয়ারা পড়েন নাই। আমরা হালে বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ করিয়াছি। বর্তমান প্রসঙ্গটা আমরা সেই শাস্ত্র অনুসারে প্রমাণ করিয়া দিতে পারি। আপনি মন দিয়া পড়িয়া যান, বিজ্ঞানশাস্ত্র যে কত যথার্থ তাহা বুঝিতে পারিবেন। উক্ত শাস্ত্রের সূত্র এই: দুইটি বস্তু এক স্থানে থাকিতে পারে না। আপনার দুধের পাত্রে জল থাকে তো? এ কথা বলিবেন জানি সেইজন্য উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা আবশ্যক। অর্থাৎ একটি স্থানে এক সময়ে দুইটি পদার্থ থাকিতে পারে না। বাটিতে দুধ পূর্ণ থাকিলে আর জল থাকিতে পারে না। কাপড় বুনিবার জন্য ভিতর বাহির দুই জায়গা দরকার। ঘরের ভিতরে কাপড় বুনিতে হয়; সূতায় মাড় দেওয়া, সরু সূতা প্রস্তুত করা ইত্যাদি কাজ বাহিরে হয়। সুতরাং সূতা মাজার জায়গায় গোবর গাদা থাকা নিতান্ত অসম্ভব। আর স্ত্রী-পুরুষ একত্র না হইলে কাপড় তৈয়ারী হইতে পারে না। সূতায় মাড় দেওয়া, লাটাই বা চরকিতে চড়ানো, নলিতে সূতা জড়ানো, এ সব তাঁতিনীদের কাজ। গাই বলদ বাহির হইতে খুঁজিয়া আনিয়া বাঁধিবার সময় কই? ইত্যাদি আরও অনেক কারণ আছে, কিন্তু কথা বাড়াইয়া লেখা আমাদের ধাতে নাই, তাই ঠিক ঠিক সব কথা লিখিয়া দিই।

১০ ॥ ভগিয়া ও শারিআ

তাঁতীপাড়ার মাথায় ভাগবত ঘর ও দধিবামনের মন্দির। তাঁতীদের জাতে তোলার টাকায় মন্দিরটি তৈয়ারী হইয়াছে। জাতে তোলার টাকা কি জানেন? অবশ্য এ কথাটা আপনাকে বুঝাইয়া দেওয়ার দরকার নাই, কিন্তু অন্যান্য নব্য বাবুদের বুঝাইয়া দেওয়া দরকার। কারণ তাঁহারা বিদ্বান, বড় বড় বিষয় পড়িয়াছেন, বড় বড় কথা জানেন; নিজের ঠাকুরদাদার নাম জিজ্ঞাসা করুন, হাতড়াইতে থাকিবেন, কিন্তু ইংলণ্ডের তৃতীয় চার্লসের পঞ্চদশ পুরুষের নাম তাঁহাদের কণ্ঠস্থ। ইংরেজ সমাজ বা ফরাসী সমাজের কথাগুলি পড়িলে লোকে বিদ্বান বলিবে, আপনার বা প্রতিবেশি জাতি ও সমাজের কথা জানিবার দরকার কি? যাক্ তাহাতে কি আসিয়া যায়? বাবুরা একথা শুনিলে রাগ করিবেন, আমাদের বলিবার দরকার কি? জাতে তোলার টাকার অর্থ এই যে স্বজাতির মধ্যে কেহ কিছু অপরাধ করিলে পঞ্চায়েত তাহাকে জরিমানা করে কিংবা কোনও গরীব জাতিভাই তাহা দিতে না পারিলে পঞ্চায়েত গোসাঁই কিছু দক্ষিণা লইয়া তাহাকে জাতে তুলিয়া নেন। টাকা পরামাণিকের* জিম্মায় থাকে। সেই টাকায় মন্দিরটি তৈয়ারী হইয়াছে। এই নিয়ম সমস্ত হাটুরে জাতির মধ্যেই আছে। আহা, এই সুন্দর প্রথাটি দিন দিন লোপ পাইতেছে। আজকাল আদালতের দ্বার খোলা, লোকেরা জ্ঞানী অর্থাৎ সভ্য হইয়াছে, পঞ্চায়েতের শাসন কে মানে? ইংরেজি আইন বলে, 'দেখ বাবা, সাবধান। তুমি যদি কিছু অপরাধ কর আর তাহার যদি আইন সঙ্গত প্রমাণ পাই, দণ্ড দিব।' চালাক লোকে বলে, 'আদৌ আপনি যাতে প্রমাণ না পান তার উপায় আমার জানা আছে।' আর উকিল তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, 'কুছ পরোয়া নেহি। টাকা আন আমি কালোকে সাদা, সাদাকে কালো করে দেব।' এতে ফল এই হইতেছে যে অনেক চালাক ও ধনবান্ লোক শত শত অপরাধ করিয়াও দিব্য গা ঝাড়া দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। নিরীহ নির্ধন লোককে হাঙ্গামায় পড়িতে হইতেছে। আর দুই পক্ষ মোকদ্দমায় টাকা বাঁটিয়া বাঁটিয়া কাঙ্গাল। সেই টাকা বারভূতে লুটিয়া খাইতেছে। কিন্তু পঞ্চায়েতের চোখে ধুলা দেওয়ার

* পরামাণিক॥ বাংলায় পরামাণিক অর্থ নাপিত, কিন্তু ওড়িশায় তার অর্থ প্রধান লোক, মোড়ল।

উপায় ছিল না। তা ছাড়া অপরাধীর কাছ হইতে উসুল জরিমানার টাকা সৎকার্যে লাগিত। নির্বুদ্ধিতার সহিত তাঁতীজাতির একটা সম্বন্ধ আছে বলিয়া সকলে বলে। কাহারও বুদ্ধির ত্রুটি দেখিলে লোকে বলে, 'আরে তুই কি তাঁতী নাকি রে?' অর্থাৎ তুই তাঁতীর মত হাঁদা। আপনি সভ্যতা শিখিয়া থাকিলে তাঁতীদের দধিবামনের মন্দির তৈয়ারির কথা শুনিয়া সেই প্রবাদকে অকাট্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবেন। আপনি বলিবেন সাধারণের টাকা এরূপ অপব্যয় কি জন্য? কলেক্‌টর সাহেবের নামে স্কলারশিপ দাও, নয় তো লাটসাহেবের নামে হাসপাতাল বসাও, মন্দির আবার কি?

আপনাদের মন যোগাইয়া চলা আমাদের কাজ, কিন্তু আপনার কথাটা আমাদের কেমনতর লাগিতেছে। আপনাকে বলিতেছি না আমাদের কথাটাই ঠিক, কিন্তু তাঁতীর বুদ্ধি অর্থ কি জানেন? ইহা একটি যোগরূঢ় শব্দ। যেমন পঙ্কজ বলিলে পদ্মই বুঝায়, পঙ্ক হইতে জাত পানা, শ্যাওলা, গেঁড়ি, গুগলি সবই কি পদ্ম? তাহা নহে। সেইরূপ তাঁতী অর্থ নির্বোধ, নির্বোধ অর্থ তাঁতী নহে। সেদিন মেঞ্চেষ্টারের তাঁতীরা যে পার্লামেণ্ট কাঁপাইয়া দিল, তাহা কি জানেন না? আপনি যে বাবু সাজিয়াছেন তাহা তো কেবল তাঁতী প্রসাদাৎ। এই রকম তাঁতীর বুদ্ধির প্রতি দোষারোপ করা এক প্রকার বেইমানি। তেমন ধরিলে আমাদের পূর্বপুরুষ সকলে তাঁতী ছিলেন। ইহার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন করিবার দরকার নাই। গ্রামে গ্রামে ঠাকুর-মন্দিরগুলো তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। কোনও বিষয়ে দুই দিক না দেখিয়া হঠাৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাঁতীত্বের চিহ্ন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। দেখা যাক্ ঠাকুরমন্দিরগুলি বাস্তবিক তাঁতীদের কাজ কিনা। অজ পাড়াগাঁয়ের লোকের কথা আপনার জানা থাকিতে পারে। তাহারা সারাদিন আপন ধান্দায় লাগিয়া থাকে, সন্ধ্যা হইলে এক এক মুঠা খাইয়া শুইয়া পড়ে। গ্রামে ধর্মপ্রচারক নাই, লাইব্রেরি নাই, ধর্মকথা কোথা হইতে শুনিবে? ঠাকুরমন্দিরে সকাল সন্ধ্যায় শঙ্খ ঘণ্টা বাজে। ছেলে হইতে বুড়া পর্যন্ত সকলকেই এই শব্দ জানাইয়া দেয় জগতে ভগবান্ আছেন। সেখানে ভাগবতের আস্থান আছে; রাধাষ্টমী, জন্মাষ্টমী কার্তিক মাস প্রভৃতি পর্বদিনে মন্দিরে ভাগবত পাঠ হয়, লোকেরা গিয়া শোনে। মন্দির না থাকিলে ভগবানের নাম বা ধর্মগ্রন্থ শুনিবার উপায় থাকিত না। বিদেশী লোকের বা গ্রামের কাহারও সুবিধা অসুবিধায় ভাত রাঁধা না হইলে পূজারীর কাছে দুইটা পয়সা ফেলিয়া দিলে এক

পেট প্রসাদ খাইতে পাওয়া যায়। গাঁয়ের লোকের দোষাদোষের পঞ্চায়েত বিচার সব ঠাকুরমন্দিরে হয়। আমরা সংক্ষেপে ইংরেজি তরজমা করিয়া দিলে আপনি সহজে বুঝিতে পারিবেন—ঠাকুরমন্দিরগুলিতে গ্রামের মধ্যে চার্চ (ভজনালয়), পাবলিক্ লাইব্রেরি (সাধারণ পুস্তকালয়), হোটেল (ভোজনালয়), টাউন হল (ভাগবত ঘর) এই চারি কার্য চলে। সে কথা যাক্, আমাদের অন্যান্য কথা লিখিতে হইবে।

অন্যান্য হাঁটুরে জাতির ন্যায় তাঁতীদেরও একজন পরামাণিক আছে। সে জাতির মধ্যে প্রধান। পরামাণিককে না ধরিলে স্বজাতি কর্ম কিছু চলে না। বিবাহে, পুনর্বিবাহে সে সুপারি দিয়া স্বজাতির সকল লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া আসে। সেজন্য তার প্রাপ্য হয় একখানি কাপড় আর-একটি সুপারি। জাতির ওজর আপত্তি নালিশ ফরিয়াদ পরামাণিকের নিকট আসিলে সে সুপারি দিয়া পঞ্চায়েত ডাকায়।

সভায় ফুল চন্দন আগে পরামাণিককে দেওয়া হয়। নিমন্ত্রণ বাড়িতে পরামাণিক আগে হরি না বলিলে কাহারও হাত ওঠে না। এই পরামাণিক পদটা পুরুষানুক্রমিক; অর্থাৎ পরামাণিকের ছেলে পরামাণিক হইবে। কিংবা তাহার বংশের কেউ হইবে। যে সে লোক হইতে পারিবে না। বর্তমান পরামাণিকের নাম ভগিআ চন্দ। ভগিআ বেচারা বড় সাদাসিধা লোক, খল-কপটতা জানে না। তাকে রাম বল—হাঁ, রহিম বল—হাঁ। গ্রামের লোকে ভগিআকে বলে বোকা তাঁতী। আপনি এবার বলিবার সোজা পথ পাইয়া গেলেন। আমরা আকারে ইঙ্গিতেই সব কথা বুঝিতে পারি। আপনার মুখের চেহারায় সব কথা বোঝা যাইতেছে। আপনি বলিতেছেন বা বলিবেন কিংবা বলিবেন ভাবিয়াছেন বা ভাবিবেন—'এরা ডাহা তাঁতী নয় তো আর কি? বাপ পরামাণিক ছিল বলে হাঁদাটাকে সর্দার করে সব তাঁতী-গুলো তাকে মাথায় করে রেখেছে। আরে বাপু, যদি একজনকে সর্দার করার দরকার হয় তবে পার্লামেন্টের মেম্বর বা ইউনাইটেড স্টেট্স-এর প্রেসিডেন্ট যেমন করে বাছা হয় তেমনি পাঁচজনের ভোট নিয়ে একজন সেয়ানা মত লোককে পরামাণিক কর। তা না করে বাপ পরামাণিক ছিল বলে অযোগ্য লোকটাকে পরামাণিক করে বসে আছ।' কথাটা ঠিক বটে। মনে ধরিলও বা। হক কথায় ট্যাঁ ফোঁ করিবার কি পথ থাকে? আমরা বরাবর তাঁতীদের দিক ধরিয়া বলিতে-ছিলাম, এখন আর পথ কই? আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি বা করিব যে তাঁতী সম্পর্কীয় কোনও কথায় আর থাকিব না। তবে তাঁতীদের চিনিয়া রাখা উচিত। হে মাননীয় পাঠক, আমাদের জ্ঞান অতি অল্প, সুতরাং তাঁতী

চিনিতে নিতান্ত অক্ষম। অনুগ্রহ করিয়া আমাদের তাঁতী চিনাইয়া দিন।

হিন্দু হইলে বেদ বেদান্ত হিন্দুশাস্ত্র অবশ্য মানিবেন। শাস্ত্রে আছে 'সমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষং ক্ষান্তিরার্জবাং মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্ম-প্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ'—এই সকল ব্রহ্মত্বের লক্ষণ। সেই ব্রাহ্মণ পূজনীয়, বরণীয়, ভক্তির যোগ্য। এইরূপ ব্রাহ্মণের পদধূলি আমরা মস্তকে ধারণ করিতে একশ বার প্রস্তুত। কিন্তু—

শুন পরীক্ষিৎ নরনাথ। চিংড়িশুঁটকী পান্তাভাত॥
ক অক্ষর বিবর্জিত। ফোঁটা পৈতাদি শোভিত॥
ক্ষেত বাছিতে সব প্রথম। দই চিড়ার সাক্ষাৎ যম॥
সন্ধ্যাগায়ত্রীহীন। ক্ষেত হইতে ধরে মীন॥
পুথির না খোলে ডোর। যজমান চাউল চোর॥
সভায় লাগে দাঁতকপাটি। নামটি সুন্দর ত্রিপাঠী॥

সুন্দর তিহাড়িকে দণ্ডবৎ করি, কারণ তিনি ব্রাহ্মণ ঔরসজাত। সুন্দর তিহাড়ি আপনার কুলপুরোহিত, যেহেতু তাঁহার বাপ পুরোহিত ছিলেন। আপনাকে বলিতে সাহস হয় না, কিন্তু আমরা খাতায় নাম লিখিয়া রাখিলাম। আবার শাস্ত্রে লেখা আছে :

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অজ্ঞান রূপ নেত্র রোগে অন্ধ ব্যক্তির চক্ষু জ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকা দ্বারা যিনি উন্মীলিত করেন সেই গুরুকে নমস্কার।

যিনি সত্য বলেন এরূপ লোককে গুরু করেন, না গুরুর পুত্র আপনার গুরু? যাক, ওসব কথা বলিয়া লাভ কি? তবে কিনা তাঁতী কে তাহা বুঝা গেল। চালনী বলে ছুঁচ তুমি কেন ছেঁদা! সেরকম দেখিতে 'কুয়াশায় সাঁতার দিবার চেষ্টা'* বহু দেখা যায়।

ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিবার মত আমরা গাঁয়ের কথা লিখিতে লিখিতে আপনার মত লোকের কথা বলিয়া বসিয়াছি। তবে কি জানেন, একটা কথা উঠিলে ঠিক হোক বেঠিক হোক সকলেই তাহাতে দু'চার কথা জুড়িয়া দেয়। সংকীর্তনে নেহাত আনাড়ীও হাঁ করে।

সে সকল কথা থাক, এখন গাঁয়ের কথা শুনুন। হাঁড়ির মাপেই সরা হয়। ভগিআ যেমন হাঁদা তার স্ত্রীও তেমনি হাঁদি। নাম শারিআ। বয়স আন্দাজ পঁচিশ† হইবে। শারিআর গুণের কথা তো শুনিলেন, রূপের

*ওড়িশায় তাঁতীর নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদবাক্য।
† সপ্তম পরিচ্ছেদে শারিআর বয়স ত্রিশ বলা হইয়াছে।—অনুবাদক।

কথা শুনিবেন কি? দেখুন, পরমুখাপেক্ষী হওয়া বড়ই খারাপ। আপন বুদ্ধি বলে অনুমান দ্বারা কিছু কিছু বুঝিবার চেষ্টা করুন। কেবল আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিবেন না। অনুমান দ্বারা কিরূপে বুঝিতে হয় তাহার মূল সূত্র শুনিলে আপনি পথ খুঁজিয়া পাইবেন। যখন শুনিবেন যুবতী রাজকন্যা, তখনই বুঝিবেন সে কন্যাটি ভারী সুন্দরী, ভারী গুণবতী। 'বাখানিতে নাই উপমা, উপমা তাহার উমা রমা।' হোক তার চালতার মত গাল, পেঁচার মত নাক, সেসব ধরিবেন না। যখন শুনিবেন ফলনা জমিদারের ঢের টাকা আছে, তখনই বুঝিয়া ফেলিবেন, তিনি রূপবান, গুণবান, দাতা, দয়ালু ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমাদের শারিআ গাঁয়ের এক তাঁতিনী, এবার সব কথা বুঝিয়া নিন। ভগিচন্দ আর শারিআ ঘরে এই দুই প্রাণী। মেয়েরা বলে, 'দুই প্রাণী ভাল, বাঁধ তল্পি চল'। আমাদের হাঁদা হাঁদিও তাই। হাঙ্গামা হুজ্জত নাই। দুইজনের নিমেষের তরেও ছাড়াছাড়ি হয় না। দুইজনে মিলিয়া মিশিয়া ঘরের কাজ করে। ভগিয়া তাঁত বোনে, শারিআ নলিতে সুতা জড়ায়, সুতায় মাড় দিবার সময় চরকিতে সুতা চড়ায়। শারিআ ভাত রাঁধে, ভগিআ উনুন ফোঁকে, জল আনিয়া দেয়। গাঁয়ের রঙ্গপ্রিয় বা নিন্দুক লোকে তাহাদের দেখিয়া ছড়া কাটে : শারি আর ভগি যেন বগা বগী। আহা! কি অপূর্ব কবিতাই না হইল। তবে আমরা বলি এমন নিন্দা যাহাদের নামে রটে তাহারাই জগতে প্রকৃত ভাগ্যবান। স্বর্গের কাল্পনিক সুখ তাহারাই প্রাণে অনুভব করে। কোনও ইংরেজ কবি বলিয়াছেন যাহারা বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম অনুভব করে, তাহারা স্বর্গীয় জীব। সেই প্রেমে যাহার কলঙ্ক সে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে।

ওহো, আমরা একটা মারাত্মক ভুল করিয়া ফেলিয়াছি! 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ'। মুনিরা লেখাপড়া করিতে করিতে বড় ভুল করিয়া ফেলেন, অর্থাৎ যাহারা লিখিবার সময় ভুল করে তাহারা মুনি। সুতরাং আজ হইতে লোকেরা যে আমাদের মুনি কিংবা ঋষি বলিবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ওহো, কি ভাগ্য! সারা বছর সাহেবের দুয়ারে নেউলের মত টুংগুস টুংগুস করা নাই, ধার কর্জ করিয়া হাজার হাজার টাকা খরচে ডাক্তারখানা বসানো নাই. নেহাত সহজ কাজ, বক্‌সিস্‌ দিয়া ফরাসিদের হাতে পায়ে ধরাও নাই. মাগনা কত বড় নামটা পাইয়া গেলাম। তবে সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে আমরা কখনও কাতর নহি। 'ন মিথ্যা পাতকং পরম্‌'। অর্থাৎ—মিথ্যা আর পাতক পরের নিকটে যায় না, নিজের কাছেই থাকে। এই জন্য আমাদের সত্য কথাই লিখিতে

হইতেছে। ভগি শারি দুই প্রাণী নহে। একটি গাই আছে, নাম নেত-অ—তাহাকে নিয়া তিন প্রাণী। গাইটিকে আমরা মানুষের সহিত ধরিলাম তাহার কারণ আছে। নেতকে শারিআ মেয়ের মত পালিয়াছে, মেয়ের মত আদর করে। পরমেশ্বর মানুষের মনে এক আশ্চর্য অপত্য স্নেহ দিয়াছেন। ক্ষুধার সময় ভাত না পাইলে লোকে যেমন গাছের পাতা চিবায় তেমনি যাহার ছেলেপিলে নাই সে কুকুর ছানাটি, বেড়াল ছানাটি কিংবা বকনা বাছুরটি পুষিয়া তাহাকে ভালবাসে। শারিআ দিনরাত নেতকে লইয়া থাকে। দড়ি খুলিয়া দিলেও নেত কোথাও যায় না, শারিআর কাছে কাছে থাকে। একটু বাইরে চলিয়া গেলে শারিআ ডাকে, 'নেতলো!' নেত বলে, 'হাঁং মা'। ছুটিয়া আসিয়া শারিআর গা চাটে, শারিআ তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া অনেক আদর করে, অনেক সুখদুঃখের কথা বলে। পান্তার বাটিতে নেত মুখ ডুবাইয়া দিলে শারিআ তাহাকে একটি ছোট আদরের চাপড় মারিয়া 'রাক্কুসী' বলিয়া গালি দেয়। আমরা জানি সেই গালির মধ্যে শারিআর আনন্দ ও স্নেহ উথলিয়া ওঠে। ভগিয়া, শারিআ, নেত তিন প্রাণী এক ঘরে শোয়। শারিআ নেতর পিছন দিকে তুষ ও ঘুঁটের গুঁড়া দিয়া ধুঁয়া দেয়। নেত বড়ই সুলক্ষণা, এই প্রথম পিছনে একটি বকনা বাছুর লাগিয়াছে। নেতর সর্বাঙ্গ কাল, মাথায় সাদা চাঁদ। 'কালী গাই মাথায় চাঁদ, তারে এনে শ্রীঘরে বাঁধ'। শিং সরু ও বাঁকানো, লেজ সরু, খুব লম্বা। লেজের আগায় চামরের মত ঘন এক গোছা লোম মাটিতে লুটাইতেছে। পিঠটি নোয়ানো, এক মুঠির কিছু কম চওড়া। পাছাটি চওড়া ঝুঁটিটি ছোট, চাল কুমড়ার মত পিঠের দিকে নুইয়া পড়িয়াছে। গলকম্বলটি অন্য গরুর চাইতে কিছু বেশী ঝুলিতেছে। পোয়াল দড়ির মত মোটা দুধের নাড়ি। পালানের কথা আর কি বলিব? 'পয়োধরীভূত-চতুঃসমদ্রাঃ'। নেত কলিঙ্গা* গাইয়ের মত তেমন উঁচু নহে, মাঝারি রকমের। ডাকের কথা আছে—

কোমর প্রমাণ গাই। এক বোরা ভুসি খাই॥
ঘাস খাওয়া বাই। তার ঠেঞে দুধ পাই॥

কথায় বলে গাইয়ের মুখে দুধ। তবে আপনি কি দুধের কেঁড়ে লইয়া গরুর মুখটা দুহিতে বসিবেন? তা নয়, গাই একটা কাগজের কলের ন্যায়। কলের মুখে ছেঁড়া নেকড়া, ছেঁড়া দড়ি, পচাঘাস, পচা তুলা ঢুকাইয়া দিন, পিছন দিয়া ধবধবে সাদা সুন্দর মসৃণ কাগজ বাহির হইয়া আসিবে। সেইরূপ গাইয়ের মুখে ভুসি ঘাস গুঁজিয়া দিন, বাট দিয়া

* কলিঙ্গা॥ দাক্ষিণাত্য হইতে আনীত এক বড় জাতের গরু।

দুধ বাহিয়া পড়িবে। নেতর দুধের পরিমাণটা আমাদের জানা নাই। সেদিন মঙ্গরাজের দরবারে নেতর কথা হইতেছিল। সকলে অনুমান করিল দুইবেলা পাঁচ সেরের কম নয়। মঙ্গরাজ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন। 'অ্যাঁ! ঐ তাঁতীটার এমন গাই?'

লোকে বলে 'পিতার গুণে পুত্র'*। কিন্তু একথাও সত্য, 'বংশনাশের বেলায় ঘোড়ামুখো ছেলের জন্ম'†। ভগির বাপ গোবিন্দচন্দ্র গাঁয়ের একজন প্রধান লোক ছিল। নিজের গ্রাম বাদে আশেপাশের দুই চারখানা গাঁয়ে পঞ্চায়েত বসিলে অমনি ডাক গোবিন্দচন্দ্রকে। বড় বড় মামলার বেলায় গোবিন্দর খোঁজ পড়িত, অর্থাৎ পেয়াদার সমন আসিলে বা ডাকে বেয়ারিং চিঠি আসিলে গোবিন্দ না যাওয়া পর্যন্ত লোকেরা ঘর হইতে বাহির হইত না। গোবিন্দ নিজে তাঁত বুনিত না, তাঁতীদের বোনা কাপড় কিনিয়া লইয়া হাটে বিক্রি করিত, কিংবা মহাজন পাইকারী দরে কিনিতে আসিলে তাহাকে বিক্রি করিত। ইহাতে তাহার বেশ দু'পয়সা হাতে আসিত। গোবিন্দর হাতে হাজার হাজার টাকা বলিয়া লোকে অনুমানবিদ্যায় গণিয়া ফেলিয়াছিল। লোকেরা আপন পরমায়ু ও পরের ধন একটু বেশী দেখে। যাহা হউক গোবিন্দ যে বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করিতেছিল এ কথা সত্য। জমিদার বাঘসিংহ বংশের পড়তির সময়ে এক এক খণ্ড জমি বিক্রি হইল। গোবিন্দপুর গাঁয়ের ধারে এক খণ্ড নাবাল জমি, ছয় মাণ আট গুণ্ঠ বাহেল নিষ্কর, তাহা গোবিন্দ কিনিয়া নিয়াছিল। 'গাঁ ধোয়া জল যেথা পশে, মোড়লের হল সেথা চষে।'‡ অস্যার্থ—মোড়ল গ্রামের সেরা জমিটুকু চাষ করে। জমিটিতে গাঁ ধোয়া জল ঢোকে, ভারী ফলন্ত জমি, জল বেশী থাকায় সেখানে রাবনা§ ধান হয়। 'জমি পাইলে সেয়ানা, ধান বুনিবে রাবনা, এক হাত লম্বা ধানের শিষ, পাড়া পড়শীর চোখে বিষ'।¶ বন্যা নাই অজন্মা নাই, একমাণ জমিতে আট ভরণ ধান তো ধরিয়াই রাখুন। ভগিয়া তাঁতীমানুষ, চাষ করিবে কি? ভাগে দিয়া একমাণে পাঁচ ভরণ পঞ্চাশ নউতি পায়। ভগি বোকা হইলে কি হইবে, তাহার অনেক সদগুণ আছে। শ্রাদ্ধ, মঙ্গলাচার, নবান্ন ইত্যাদিতে জাতি ভাইদের পাত পড়ে, ভিখারী বৈরাগী দুয়ার হইতে ফেরে না। 'বোবার শত্রু নাই', হাঁদা হাঁদি কথা কহিতে জানে না, গাঁয়ের ঝগড়া বিবাদ হইলে দুয়ারে খিল দিয়া বসিয়া

* ওড়িয়া প্রবাদ। † ওড়িয়া প্রবাদ। ‡ ওড়িয়া প্রবাদ।
§ রাবনা—ওড়িশার এক প্রকার ধান, ফলন খুব বেশী বলিয়া ঐ নাম।
¶ ওড়িয়া প্রবাদ।

থাকে। গাঁয়ের সকলে ইহাদের ভালবাসে। অভাব সমস্ত দুঃখের মূল। ধন, বিদ্যা, খ্যাতি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি কোনও বাঞ্ছনীয় লোভনীয় এবং অত্যাবশ্যক পদার্থের অভাব হইলে লোকে কষ্ট অনুভব করে। আমাদের তন্তুবায় দম্পতির কোনও পদার্থের অভাব নাই। পবিত্র দাম্পত্য স্নেহ, বিশুদ্ধ প্রেম, অখণ্ড সন্তোষ, নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্য, সরল ধর্মভাব প্রভৃতি স্বর্গীয় ভাবের একত্র সমাবেশ যদি আপনি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমরা এই গ্রাম্য তন্তুবায় পরিবারের নাম করিতে পারি। আমরা আজন্ম-কাল দেখিয়া শুনিয়া পড়িয়া বুঝিয়াছি নিরবচ্ছিন্ন সুখ, বিধি মানুষের কপালে লেখেন নাই। তন্তুবায় পরিবার কি এই নৈসর্গিক নিয়মের বহির্ভূত? মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন, 'প্রায়েণ সামগ্র্যবিধৌ গুণানাং-পরাঙ্মুখ বিশ্বসৃজঃপ্রবৃত্তি'। এই মহাবচনের বা কি করিয়া অমর্যাদা করিব?

তবে কি ইহারা পূর্ণ সুখী নহে? কে বলিবে, কেমন করিয়াই বা বলিবে? শালগ্রামের শোয়া বসা সমান। মানুষের হৃদয়ভাব, হাস্য ক্রন্দন স্রোত ধরিয়া বাহির হইয়া আসে। ইহাদের হাসিতে কেহ দেখে নাই, কাঁদিতে কেহ শুনে নাই। কথা হইতে বুঝা যাইত, কাহারও সহিত তো কথা বলিবে না। আমাদের কাছে কিন্তু কাহারও কথা লুকাইবার উপায় নাই। ব্যাধেরা পায়ের চিহ্ন ধরিয়া ধরিয়া গিয়া জন্তুর দেখা পায়। সেই-রূপ আমরা লোকের কার্যকলাপের পিছন ধরিয়া ধরিয়া গিয়া তাহাদের মনের ভাব ঠাহর করি। সেদিন রাত্রে রুকুণীর মার বউয়ের ষেটেরায় শারিআ গিয়াছিল, ছেলেকে একবার দেখিয়াই চলিয়া আসিল, চকুলি* খাওয়া পর্যন্ত রহিল না। ঘরে ফিরিয়া পেট কামড়াইতেছে বলিয়া না খাইয়া শুইয়া পড়িল। আমরা ইহাও জানি যে অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে না ঘুমাইয়া এপাশ ওপাশ করিতেছিল। ভগিআ একবার বলিল, 'দৈব তো দেয় নি, দুঃখ করলে কি হবে?' কি দেয় নি কিছু তো বুঝা গেল না? বার ব্রতে শারিআর আজকাল খুব মন।

বুড়িমঙ্গলার উপর বেশী বেশী ভক্তি দেখা যাইতেছে। ডাক্তার ও উকিলের দুয়ারে কাহাকেও দেখিলে বুঝিয়া নিবে তাহার কোনও বিপদ হইয়াছে। বুড়িমঙ্গলার দ্বারা ডাক্তার ও উকিল দুইয়ের কাজই হয়। গাঁয়ে কাহারও কিছু অসুখ করিলে কিংবা মামলা মোকদ্দমায় পড়িলে মঙ্গলাঠাকুরাণীর কিছু লাভ হয়। মঙ্গলার উপরে শারিআর ভক্তি দেখিয়া বুঝিতেছি তাহার মনে কোনও কষ্ট জন্মিয়াছে। বারান্দায় বসিয়া যখন

* সরু চাকলির মত একপ্রকার পিঠা।

লাটাই ঘোরায় তখন কাহারও কোনও ছোট ছেলেকে খেলিতে দেখিলে তাহার হাতের লাটাইটা আর ঘোরে না। উপবাস পূর্ণিমা ইত্যাদিতে ঘরে পিঠাটি ছানাটি হইলে শারিআ নিঃশ্বাস ফেলে। ভগি দিব্য গালিয়া কোনও রকমে না খাওয়াইলে খায় না। সেদিন ছোট কন্তার জোড় ফরমাস দিয়া একজন ভগিকে দিয়া বুনাইয়া নিল। জোড়টি বুনা হইয়া গেলে শারিআ সেটিকে বহুক্ষণ ধরিয়া ভাঁজ করিতে লাগিল, তাহার চোখে জল টলটল করিতে দেখিয়া ভগি একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলিল।

১১॥ গোবরা জেনা

তাঁতীপাড়ার চারশ-পাঁচশ কদম দূরে মাঠের মাঝখানে ডোমপাড়া। এটা আলাদা মৌজা নহে, গোবিন্দপুরের সামিল। সেখানে দশ ঘর ডোম আর চৌকিদার গোবরা জেনার ঘর। গোবরা জেনা আপন মৌজায় চৌকিদার, তার দেড়মাণ জমি চৌকিদারি বাবদ জায়গীর আছে, ইহা ছাড়া প্রতি ঘর হইতে ধান কাটার সময় একটা করিয়া ধানের আঁটি পায়। পূর্বোক্ত জেনা আপনার কাজে খুব হুঁশিয়ার। তাহার জন্য গ্রামে চুরি চামারি হয় না। প্রতি বছর গ্রামে চার পাঁচটি সিঁধ কাটিয়া চুরি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে জেনার কিছু দোষ নাই; কারণ সেই সকল চুরির রাত্রে জেনার পো জাতিধর্মের কাজে চার পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী গ্রামে চলিয়া যায়। চৌকিদার সারারাত গ্রামে পাহারা দেয়, কিন্তু এমন সাবধানে যে সেকথা কেহ কখনও জানিতে পারে না। চেঁচাইয়া পাহারা দিলে গলা শুনিয়া চোর যে পলাইবে। সেকালের পুলিস ভারী ঘুষখোর ছিল, এমন একটা প্রবাদ আছে। সত্য মিথ্যা জগন্নাথই জানেন। লোকের মুখ কে বন্ধ করিবে? বাঘ মানুষ খায়—সব বাঘই কি মানুষখেকো? সাধু সচ্চরিত্র বাঘ কি দুনিয়ায় নাই? আমাদের জেনার পো সেইরূপ একজন সাধু সচ্চরিত্র লোক। আপন হক অর্থাৎ বার্ষিক ফসলের পাওনা আঁটি, বিবাহ পুনর্বিবাহ কর্মবাড়িতে একখানা কাপড়, বরের নিকট হইতে চৌকিদারী আদায় উপরি একটি টাকা আর দুর্ভিক্ষ অজন্মার ভাতা বাবদে কিছু খরচা এবং ঘরের চালের লাউটা কুমড়াটা ছাড়া কাহারও কাছ হইতে কিছু ঘুষ সে ছোঁয় না। আর চুরি, সাপে কাটা, জলে ডুবি প্রভৃতি মামলা হইলে পুলিসে এত্তেলা দেওয়ার খরচা এক টাকা সে তো আইনেই রহিয়াছে, তাহাতে চৌকিদারের তো কোন হাত নাই। বরঞ্চ গোবর্ধন ভারী দয়ালু লোক, কোনও গরীবের মামলা হইলে একখানা ঘটি কি বাটি কিছু লইয়া কাজ করিয়া দেয়। মাসে একবার পুলিসে রিপোর্ট দিতে যাইবার সময় গ্রাম হইতে কলা এক কাঁদি, লাউ কুমড়া কয়েকটা মুনশী জমাদার বরকন্দাজের জন্য নিতে হয়, এতো জানাশোনা কথা। কাজের ঝঞ্ঝাটে রাত্রিবেলাটি জেনার পোয়ের আর ঘরে ভাত খাওয়া হইয়া উঠে না। পালা করিয়া গাঁয়ের লোকের ঘরে খাইতে হয়। যাহার ঘরে যেদিন খাইবার কথা, বেলা থাকিতে থাকিতে এক মুঠা চাল

নিতে বলিয়া যায়। সুবিধা অসুবিধা বশত ভাত না হইয়া উঠিলে জেনার পো সেদিন রাত্রে তাহার ঘর-পাহারার কাজে ঢিলা দেয়। চোরেরা তখনই সে কথা জানিতে পারিয়া সেই রাত্রেই তাহার চালের উপর হইতে বা খিড়কির দিক হইতে কলাটা মুলাটা বা জমি হইতে ধান চুরি করিয়া লইয়া যায়, কিংবা কিছু না পাইলে সদর দুয়ারের খুঁটিটা ভাঙিয়া দিয়া যায়। গোবর্ধন গাঁয়ে ভাত খাইয়া নিজের ঘর পর্যন্ত 'গাঁয়ের লোক হুঁশিয়ার, ঘরওয়ালে খবরদার' চীৎকার করিয়া ডাক দেয়। যে সব ছেলেরা ঘুমায় নাই তাহারা সেই ডাক শুনিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। তারপর সে গাঁয়ে সারারাত পাহারা দেয়, একথা কেহ জানিতে পারে না। গোবরা জেনাকে একটা সামান্য পাণ-অ* বলিয়া ভাবিবেন না। সে হাজার পাঁচশ গনিয়া দিতে পারে। ধানও পাঁচ সাত ভরণ ঘরে তোলা আছে। যে যতই হুঁশিয়ার হোক, আপদ বিপদ কাহাকেও রেয়াত করে না। একবার সে একটা চুরির মামলার দায়ে পড়িয়াছিল। শোনা যায় আড়াইশ টাকা মুনশীকে ধরিয়া দিয়া খালাস পাইয়াছিল। সেই মামলার বিষয় এই, মাখনপুর মৌজার ভুবনি শা তেলী মহাজনের ঘরে ডাকাতির মোকদ্দমায় আটজন ডাকাত গ্রেফতার হয়। গোবরা জেনার সলাপরামর্শে এই ডাকাতি হইয়াছিল এবং আরও দশ পনেরটি চুরিতে তাহার সাট ছিল, এবং চোরাই মাল সমস্ত তাহার দ্বারা বিক্রয় হইয়াছিল বলিয়া আসামীদের মধ্যে হইতে দিকাড়িআ পাণ প্রকাশ করিয়া দিল। কিন্তু অন্যান্য আসামীরা একথা অস্বীকার করায় গোবরার গায়ে আঁচড়টি লাগে নাই।

গোবরা জেনার যোগ্যতায় মঙ্গরাজ তাহার উপরে ভারী খুশী। সে সকাল সন্ধ্যায় মঙ্গরাজের কাছারিতে হাজির থাকে। মাঝরাতে গোবরা ও মঙ্গরাজকে নিরালায় বসিয়া থাকিতে লোকে দেখিয়াছে। ফতেপুর সরষণ্ড তালুকে অনেক পাণর ঘর আছে। চুরি ডাকাতি রাহাজানি করাই তাহাদের ব্যবসা বলিয়া লোকে সন্দেহ করে। পুলিস এবং জেলখানার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এই সন্দেহের কারণ। গোবর্ধনের একটি মহৎ গুণ কোনও পাণ জেলে গেলে তাহার অসহায় ছেলেপিলেদের সেই চালায়, এবং মঙ্গরাজের খামার হইতে বিলানো ধান আনিয়া দেয়। কিন্তু নিন্দুক লোকের সবতাতেই নিন্দা, কিছুই বাদ যায় না। লোকেরা গোবর্ধনের এই সদগুণের অন্য রকম অর্থ করে। সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গরাজের এই দানশীলতার কথা উল্লেখ করাও একটা বড় খারাপ ইঙ্গিত।

* পাণ (উচ্চারণ অ-কারান্ত), ওড়িশার হরিজন জাতি বিশেষ।

১২ ॥ অসুর দীঘি

গোবিন্দপুর মৌজায় একটি মাত্র পুষ্করিণী। গ্রামের সকল লোক ইহার জলে কারবার করে। পুষ্করিণীটা খুব বড়, আড়ে-দীর্ঘে মাপিলে দশ বাটির* কম হইবে না। নাম অসুর দীঘি। ইহাতে আগে ষোলটা দীপদাণ্ডি† ছিল, দেবতার প্রভাবে সব ডুবিয়া গিয়াছে। জলের ধার হইতে চারিদিকের পাড় দশবার হাত উঁচু। এই পুষ্করিণী কত কালের, কে খোঁড়াইয়াছিল ইহার সঠিক বৃত্তান্ত আমরা বলিতে অক্ষম। শোনা যায়, অসুরেরা খোঁড়াইয়াছে। অসম্ভব নহে। এত বড় কীর্তি যে করিতে পারে সে কি আমাদের মত মানুষ? গ্রামের পঁচানব্বই বছরের বুড়া একাদুশিআ তাঁতীর মুখে পুষ্করিণী সম্বন্ধে যে ইতিহাস-সার সংগ্রহ করিয়াছি ইহাই তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত।

বানাসুর এই দীঘি খোঁড়াইয়াছিল। সে আপন হাতে কোদাল ধরিয়া খোঁড়ে নাই। তাহার হুকুমে অসুরেরা আসিয়া রাতারাতি খুঁড়িয়া ফেলে। খুঁড়িতে খুঁড়িতে রাত পোহাইয়া গেল। দক্ষিণ পাড়ের কোণে বার চৌদ্দ হাত চওড়া একটা মুখ আছে, সেখানে মাটি ফেলিবার আর সময় ছিল না। রাস্তায় লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে, অসুরেরা এখন কোথায় যায়? দীঘির ভিতরে গর্ত খুঁড়িয়া একেবারে গঙ্গার ধারে আসিয়া বাহির হইল। সেখানে গঙ্গাস্নান সারিয়া পলাইল। আগে গঙ্গাসাগরে বারুণী হইলে অসুর দীঘিতে জল উজাইয়া আসিত। গ্রামে বহু অনাচার হওয়ায় আজকাল আর আসে না। ইংরেজি পড়ুয়া বাবুরা সাবধান! আমাদের একাদুশীচন্দ্রের ইতিহাস শুনিয়া হাসিবেন না, তাহা হইলে মার্সম্যান্ ও টড্ সাহেবের লেখার আট আনাই কোথায় উড়িয়া যাইবে।

দীঘিতে মাছ আছে। আপনি বলিবেন, যেথায় জল সেথায় মাছ, একথা লিখিবার দরকার কি? কিন্তু আপনার কথাটা যুক্তিসঙ্গত হইল না। আখের সহিত গুড়ের, দেহের সহিত হাড়ের যেমন নিত্য সম্বন্ধ, জলের সহিত মাছের সেরূপ কিছু নহে। তাহা হইলে আপনার বাড়ির জলের কলসী হইতে তো মাছ বাহির হইত। অনুমান বা অযৌক্তিক

*বাটি॥ মাপ বিশেষ, ৬০ বিঘায় ১ বাটি।

†দীপদাণ্ডি॥ পুকুর অথবা দীঘির মাঝখানে পোঁতা খুঁটি কিংবা মন্দিরাকৃতি ঘর।

কথা বলা আমাদের অভ্যাস নয়। অস্বর দীঘিতে যে মাছ আছে, আমরা তাহার অকাট্য প্রমাণ দিব। এই দেখ্বন দক্ষিণ পাড়ে জল হইতে পাঁচ হাত উপরে হাঁ করিয়া ছোট বড় তিনটা লম্বা-ঠোঁটওয়ালা কুমীর পড়িয়া আছে। রোজই পড়িয়া থাকে। ইহারা কি জন্য দীঘিতে আছে? কি খাইয়া বাঁচে? তাহাদের গর্ব ছাগলের মত মাঠে ঘাস খাইয়া চরিতে কি কেহ দেখিয়াছে? না তাহারা জৈনদের মত অহিংসা পরমধর্ম বলিয়া মানে? অবশ্যই দীঘি হইতে কোনও পদার্থ খাইয়া বাঁচিয়া আছে। সে কি পদার্থ? এই লম্বা-ঠোঁটওয়ালা কুমীরের নামই মেছো কুমীর, অর্থাৎ ইহারা মাছ খায়। কেহ বলিবেন, ইহারা মাছ খায় সত্য, অন্য কোথাও হইতে আনিয়া খায়। হাটে শ্বঁটকী মাছ মিলে বটে, তবে ইহাদের পয়সা নিয়া হাটে মাছ কিনিতে যাইতে তো কখনও দেখা যায় নাই। আর গাঁয়ে জেলেনীরা মাছ বেচিতে আসিলে গাঁয়ের মেয়েরা ধান-চাল বদল দিয়া মাছ কেনে। আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি কুমীরদের তো সের্প ধান-চাল দিয়া মাছ কিনিতে কখনও দেখি নাই। স্বতরাং প্রমাণ হইল দীঘিতে মাছ আছে। এইট্বকুই যে যথেষ্ট প্রমাণ তাহা নহে, তবে আরও অনেক অকাট্য প্রমাণ আছে। এই দেখ্বন চারটা কাদাখোঁচা যাত্রার দলের ছেলেদের মত নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়াইতেছে। তোড়ীর* ছানাটির দণ্ড-ইয়েরা† ছানাটির ঘাড় ভাঙিগতেছে বলিয়াই না এত নাচন কোঁদন। কেহ বলিবেন, কাদাখোঁচাগ্বলো কি নিষ্ঠ্বর কি দ্বষ্ট, পরের গলা টিপিয়া এত আনন্দ? ভাই, কি বলিব, বেচারা কাদাখোঁচাকে নিষ্ঠ্বর বল, দ্বষ্ট বল, শয়তান বল, যাহা বল সে কিছ্ব তোমার নামে মানহানির মোকদ্দমা র্জ্ব করিবে না। কিন্তু জানিও, তোমার মান্বষ জাতভাইদের মধ্যে যে যত ট্বঁটি টিপিতে পারে সে তত বড় বাহাদ্বর। সেই মান্য, সেই গণ্য, 'স চ দর্শনীয়', একথা কি জানেন না? চার পাঁচ গণ্ডা সাদা বক, চার পাঁচটি কোঁচবক ছোটলোক মজ্বরের ন্যায় সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাদা চটকাইতেছে। দীঘিতে যে মাছ আছে ইহা তাহার তৃতীয় প্রমাণ। দ্বইটা পানকৌড়ি কোন দেশ হইতে উড়িয়া আসিয়া দীঘির মধ্যে দ্ব' চারবার ডুব দিয়া পেট ভরাইয়া আবার ফর ফর করিয়া উড়িয়া গেল। একটা পানকৌড়ি তীরে বসিয়া ডানা শ্বকাইতেছে যেন গাউন পরা মেম-সাহেব। হে হিন্দ্বধর্মাবলম্বী বকেরা, ইংরেজ পানকৌড়িদের দেখ, কোন দেশ হইতে খালি পকেটে উড়িয়া আসিয়া চ্যাঙ ব্যাঙ খলিশায় পেট

*তোড়ী॥ পাঁকাল মাছ।
†দণ্ডেই॥ ওড়িশার বিভিন্ন জাতির মাছ।

পুরাইয়া চলিয়া গেল। দীঘির ধারে বটগাছে তোমাদের বাসা, সারাদিন জল ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া দণ্ডেইয়ের বাচ্চা কেরাণ্ডির* বাচ্চার বেশী কিছু পাও না। জীবন-সংগ্রামকাল উপস্থিত, এইবার আরও পালে পালে পানকৌড়ি আসিয়া চ্যাঙ ব্যাঙ সব তুলিয়া লইয়া যাইবে। তোমরা বিদেশে গিয়া সমুদ্রে সাঁতার কাটিতে না শিখিলে আর রক্ষা নাই।

চিল খুব সেয়ানা; ভারী হুঁশিয়ার; গুরু গোঁসাইয়ের ন্যায় ডালের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে, একবার জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া যাহা তুলিয়া নেয় তাহাতে তাহার একদিন চলিয়া যায়। গোঁসাইরা সারা বৎসর বারান্দা হইতে নামেন না, বৎসরে একবার শিষ্যের দুয়ারে ঝাঁপ মারেন।

জলের ধার হইতে দীঘির ভিতর চল্লিশ পঞ্চাশ হাত পর্যন্ত পানিফল ও দামে বোঝাই। সেই দামের মধ্যে হিন্দুবাড়ির কুলবধূর ন্যায় শালুক-ফুলগুলি রাত্রে চুপে চুপে ফোটে, দিনের বেলায় ঢাকিয়া ঢুকিয়া থাকে। তাহার মধ্যে শিউলি ফুলগুলি আইবুড় মেয়েদের মত লজ্জা নাই সরম নাই দিনরাত বাতাসে ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছে। দীঘির ভিতরে লাল-শালুক। ইহারা শিক্ষিতা খ্রীষ্টান লেডি, শালুকের সমাজ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, পদ্মের সমাজে মিশিতে পারে নাই। দীঘির মাঝে দাম নাই; রাত্রে বুড়িমঙ্গলা ঠাকুরানী সেখানে ঘুরিয়া বেড়ান তাই দাম হইতে পারে না। দীঘির মধ্যস্থল ভারতের কবিকুলের সর্বস্বধন, লক্ষ্মীর নিবাস, সরস্বতীর আসন, ব্রহ্মার জন্মস্থান পদ্মবনে পূর্ণ। ফুলগুলিতে ঠাকু-রানীর ষোল আনা অধিকার। একজন একবার একটা ফুল আনিতে সাঁতরাইয়া গিয়াছিল। ঠাকুরানী তাহার পায়ে শিকল লাগাইয়া জলের ভিতরে টানিয়া নিলেন। সেই দিন হইতে আর কেহ ফুলের দিকে তাকায় না।

অসুর দীঘিতে চারিটা ঘাট। ধরিতে গেলে তিনটা; দক্ষিণের ঘাটে কেহ যায় না, গ্রামের কেহ মরিলে সেই ঘাটে তাহার দাহক্রিয়া হয়। এই ঘাটটা বড় ভয়ংকর স্থান, রাত্রি তো রাত্রি, দিনের বেলাতেই কাহাকেও সেখানে যাইতে দেখা যায় না। এই ঘাটের কাছে একটি খুব বড় অশ্বত্থ গাছ আছে, সেখানে সর্বদা দুইটা ব্রহ্মদৈত্য থাকে বলিয়া সকলে জানে। মাঝরাতে দৈত্যেরা গাছের আগায় বসিয়া দীঘির মাঝখানে লম্বা পা বাড়াইয়া দেয়, অনেকে দেখিয়াছে। কে কে দেখিয়াছে নাম জানা নাই, কিন্তু দেখিয়াছে সত্য। তাছাড়া এই পাড়ে অনেক পেতনী ডাইনী চিরকাল বাসা বাঁধিয়া আছে, অন্ধকার রাত্রে আলো জ্বালাইয়া মাছ ধরে, বিশেষত বর্ষার অন্ধকার রাত্রে পালে পালে ঘুরিয়া বেড়ায় ইহার প্রত্যক্ষ

* কেরাণ্ডি॥ পুঁটি মাছের ওড়িয়া নাম।

প্রমাণ যথেষ্ট আছে। পূর্বদিকে ধোপাদের ঘাট। দুইজন ধোপা ইশ্ ইশ্, রাম রাম বলিয়া পাথরের উপরে কাপড় আছড়াইতেছে। 'গাঁয়ের গুণ ধোপার ঠাটে'*। চটের পালের মত মোটামোটা এক গাড়ি ময়লা কাপড় গাদা হইয়া আছে। কাপড় সিদ্ধকরা ও শুকানোর কাজে চারিজন ধোপানী লাগিয়াছে। উত্তর পশ্চিম কোণে তাঁতীদের ঘাট। গাঁয়ের মধ্যস্থলে থাকায় সেখানে সকালে মেয়েদের হাট বসে। হাটের নাম শুনিয়া আপনি মনে করবেন না যে এখানে স্ত্রীলোক কেনাবেচা হয়। চীৎকার ও জনতায় সেইরূপ হওয়ায় হাট বলিলাম। বাড়ির গৃহিণীদের স্নান করিবার সময় ভারী ভিড় হয়। গ্রামে 'ডেলি নিউজ' খবর-কাগজ ছাপা হইলে সম্পাদককে সংবাদ সংগ্রহের জন্য বেশী পরিশ্রম করিতে হইত না। একখানি পেনসিল ও কাগজ লইয়া এইখানে বসিলে সমস্ত সংগ্রহ করিতে পারিতেন—গতরাত্রে কাহার ঘরে কি রান্না হইয়াছিল, আজ রান্নার কি ব্যবস্থা, কে কখন শুইল, কাহাকে কত মশা কামড়াইল, কাহার ঘরে নুন ছিল না, কে একটু তেল ধারে আনিয়াছে, রামার মায়ের নূতন বউটা বড় ঝগড়াটি, কাল আসিল আর আজ শাশুড়ীকে চোপরা, কমলী কবে শ্বশুর বাড়ি যাইবে, সরস্বতীর মেয়েটি বড় ভাল, রাঁধে যেমন লজ্জা সরমও তেমনি, পদী জলে বসিয়া দাঁত মাজিতে মাজিতে একটি ছোট বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছে—সারমর্ম তাহার মত রাঁধিতে গ্রামে আর কেহ পারে না, ইত্যাদি ইত্যাদি দরকারী অদরকারী কথা অবিশ্রান্ত চলিয়াছে। কয়েকজন সুন্দরী মুখের সৌন্দর্য আরও বাড়াইবার জন্য আঁচল দিয়া মুখ রগড়াইতেছে। লক্ষ্মী রগড়াইয়া রগড়াইয়া বসনী† উপরে নাকের পাতা দুইটা রাঙা করিয়া ফেলিয়াছে। বিমলী জলের ধারে বসিয়া আপন হাতের বাইশ পল‡ ওজনের পিতলের মানতাসা আধ ঝাঁকা খানিক বালি দিয়া সবলে মর্দন করিতে করিতে কোনও অজ্ঞাতনামা লোকের উদ্দেশে অভিধানবহির্ভূত শব্দসকল প্রয়োগপূর্বক এক দীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছে। গত রাত্রিতে তাহার কুমড়া গাছ কাহারও গরুতে খাইয়া গিয়াছে ইহাই বক্তৃতার বিষয়। বিমলী ক্রমশঃ গোস্বামীর ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষের প্রতি কুৎসিত পদার্থবিশেষ দ্বারা খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া গরু-অত্যাচারিত আপন খিড়কির ভূমির উর্বরতা, কুষ্মাণ্ডবৃক্ষের তেজস্বিতা ও ভবিষ্যৎ ফলবত্তা এবং অচিরাৎ গোস্বামীর ভারী বিপদ উপস্থিত হইলে

*ওড়িয়া প্রবাদ।
†বসনী॥ ওড়িয়া নারীর লঙ্কাকৃতি নাকছাবি।
‡পল॥ ওজন বিশেষ, তোলা।

গরুটিকে ব্রাহ্মণকে দানস্বরূপ দিয়া দিতে হইবে সে সম্বন্ধে বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছে। আমরা ঘাট হইতে আরও অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিতাম কিন্তু হঠাৎ মার্কণ্ডিআর মা আর যশোদার মধ্যে ভয়ংকর কলহ উপস্থিত হওয়ায় সমস্ত কথা বন্ধ হইয়া গেল।

যশোদা জলের মধ্যে পেট ডুবাইয়া দাঁত মাজিতেছিল। পাঁচ বৎসরের ছেলে মার্কণ্ডিআ নাচিয়া কুঁদিয়া জল ঘোলা করিল এবং গায়ে জলের ছিটা পড়ায় যশোদা জল হইতে উঠিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া কুৎসিত ভাষায় ছেলেটাকে গালি দিতে লাগিল, এবং তাহার পরমায়ুর অল্পতা কামনা করিল। তখন মার্কণ্ডিআর মা দৌড়িয়া আসিয়া সমান স্বরে উপযুক্ত উত্তর দিতে লাগিল। অবশেষে পরাস্ত হইয়া ছেলেকে এক চড় কষাইয়া জলের কলসী কাঁখে গর গর করিতে করিতে মার্কণ্ডিআর হস্তধারণপূর্বক মার্কণ্ডিআর মার গৃহাভিমুখে গমন এবং দাঁত খিঁচাইয়া ভ্যাঁ ভ্যাঁ করিয়া মার্কণ্ডিআর ক্রন্দন। ইতি যুদ্ধকান্ড।

বজ্রপাত হইয়া গেলেও মেঘের ঘড়ঘড়ানি শব্দ আকাশে অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিতে থাকে। ঝগড়া মিটিয়াছে কিন্তু সমালোচনা অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল। বুড়ী ও আধবুড়ী স্ত্রীলোকেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া কেহ মার্কণ্ডিআ, কেহ যশোদার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। আমরা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে যশোদার পক্ষপাতী। বিশেষ বিবেচনা ও সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা বুঝিতেছি যে উপস্থিত উৎপাতের মূল কারণ মার্কণ্ডিআ— সে সম্পূর্ণরূপে দোষী, তাহার অপরাধ অমার্জনীয়। তাহাকে আরও গালি দাও, মার বা অন্য কিছু কর আমরা সে জন্য জবাবদিহি করিতে প্রস্তুত আছি। ভাবিয়া দেখুন, জল মানুষের জীবন, আবার তাঁতীঘাটের জল সকলে খায়, সে জল ঘোলা করা কি সামান্য অপরাধ? দেখ দেখি, প্রায় শ'খানেক স্ত্রীলোক গা ধুইতে আসিল, সকলেই প্রায় পেট ডুবাইয়া জলের মধ্যে বসিয়া দাঁত মাজিল। তাহাদের মুখ নিঃসৃত নবফেনখন্ডবৎ শুক্লবর্ণ থুতু গয়ের চারিদিকে ভাসিতেছে, ঈষৎ লোহিত পাটলাভ চাপ চাপ জিভছোলা ময়লাও ভাসিতেছে. তাহার সহিত আর কিছু ভাসিতেছে কিনা বলা যায় না, কারণ সমস্ত স্ত্রীলোক মাঠ হইতে আসিয়া জলশৌচ করিয়াছে। অন্য লোকের কথা ছাড়িয়া দিন, নিজে যশোদা সেইরূপ করিয়াছে বলিলে সে অস্বীকার করিবে না। ইহা তো সনাতন প্রচলিত প্রথা, অপরাধের বিষয় যে লুকাইব? একজন রসিক লোক একবার বলিয়াছিল মেয়েরা পুকুর হইতে কলসীতে যত জল নেয় তাহার পোয়া ভাগ ছাড়িয়া যায়। একথা ঠিক সত্য হইলেও আমাদের চক্ষুর অগোচর।

কত জনে শুইবার হেঁস-অ* কাচিয়া নিয়া গেল, কচি ছেলেদের শুইবার কাঁথা ও সকল রকম নেকড়া চোকড়া কাচা হইল দেখা গেল; সে যাহা হউক মেয়েরা ঘাটে এত কর্ম করিলেও মার্কণ্ডিআর মত নাচিয়া কুঁদিয়া কেহ কিছু করে নাই। নাচা কুঁদা না করিলে কি জল ঘোলা হয়? এই জন্য আমরা বলিতেছি মার্কণ্ডিআর অপরাধ নিতান্ত উৎকট বটে।

তাঁতীঘাট হইতে তিন শ কদম তফাতে বাবুদের ঘাট। সকালবেলা এ ঘাটে কোনও স্ত্রীলোক যায় না, সম্পূর্ণরূপে পুরুষদের দখলে থাকে। বৈশাখ মাসের দিন, বেলা ছয় ঘড়ি না হইতে আকাশ হইতে আগুন ঝরিয়া গরম হাওয়ায় গায়ে যেন ফোসকা পড়িতেছে। চাষের জমি হইতে ধুলা উড়িতেছে, মনে হইতেছে মাটিতে আগুন লাগিয়া ধুঁয়া উঠিতেছে। ঘাট লোকে ভরিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের পিছাইয়া পড়া জ্যোৎস্না রাত্রির তিন প্রহরের সময় চাষারা লাঙগল জুতিয়াছিল, সকলের লাঙগল খোলা হইয়াছে। কেহ ঘরের দেওয়ালে লাঙগল ঠেসান দিয়া একটু তেল মাথায় মাখিয়া ও পাঁচ আঙগুলে করিয়া গায়ে মাখিয়া আসিয়াছে, কাহারও কাঁধে আধ আঙগুল পুরু মাড় দেওয়া গামছা, কেহ নির্গামছা, কয়েকজন আর ঘরে না ঢুকিয়া সোজা মাঠ হইতে আসিয়া ঘাটে বলদের কাঁধ হইতে জোয়াল নামাইয়া জলে নামিল। কয় জোড়া বলদ এক এক পেট জল খাইয়া পুকুর পাড়ে চরিতেছে। কয়জন শুকনা দাঁতন চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া জলে নামিয়া জিভ ছুলিয়া ডাঙায় দাঁতন ফেলিয়া দিল। ঘাটের দুইপাশে আধ গাড়ি আন্দাজ শুকনা দাঁতন জমা হইয়া আছে। পুরুষেরা যে চুপচাপ স্নান করে তাহা নহে, মেয়েদের মত তাহারাও ঢের কথা বলে, কিন্তু সেই একরকম কথা, সেই পুরানো কথা; সেগুলা লিখিয়া কি হইবে? মাঠে কত বোনা হইয়া গিয়াছে—বটতলার জমি আজ দ্বিতীয়বার লাঙগল দেওয়া হইল—রামা বড় জমিতে অক্ষিমুঠি† ফেলিল—ভীমার বলদ ভারী কাজের—জমিদার বাড়ির ধলা বলদ দুইটা বলদ তো নয়, দুইটা হাতীর বাচ্চা—আমি পাটকিলে বলদটা কিনিয়া একমুঠা টাকা জলে ফেলিয়া দিয়াছি—জমিদার বাড়ির কর্জা ধানের গোলা এই মাসে খুলিবে—এই মাসের পনের তারিখে শ্রবণা নক্ষত্র পড়িবে, গনৎকার বলিয়াছে নাগাড় বর্ষা হইবে। এ সকল কথা সকলেই জানে, অধিক কি লিখিব?

‡ হেঁস (উচ্চারণ অ-কারান্ত)॥ ওড়িশায় শয্যায় ব্যবহৃত বেনা ইত্যাদি তৃণ-নির্মিত পুরু পাটি।

* অক্ষিমুঠি॥ অক্ষয় তৃতীয়ায় চাষী প্রথম বীজবুনিবার জন্য মুঠায় করিয়া যে বীজ বোনে।

১৩ ॥ হিতোপদেশ

প্রথমা—ভারী তো ফিসফাস? দ্বিতীয়া—উঠবে যে বাস।
প্রথমা—চাষ না বাস? দ্বিতীয়া—সর্বনাশ।
এ কে রে বাবা! তাঁতীঘাটে কবিতা!

গিন্নীদের গা ধোয়ার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁতীঘাটে দুটি মাঝবয়সী স্ত্রীলোক পরস্পরের হাত দশেক তফাতে বসিয়া দাঁত মাজিতে মাজিতে এই কথাগুলি বলিয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল; মুচকিয়া হাসিয়া আবার যেন ভয় পাইয়া চুপ করিল।

আপনি চেঁচাইয়া কথা বলুন তাহাতে কেহ কান দিবে না—নেহাত কাছের লোকও তেমন খেয়াল করিবে না। কিন্তু দুইজন ফিসফিস করুক লোকের মন দেখিবে সেইখানে, কথাটা শুনিবার জন্য সকলের মন আঁকু-বাঁকু করিতে থাকে। বাস্তবিক ছোট বীজের ভিতর যেমন বড় গাছ লুকাইয়া থাকে তেমনি চুপি চুপি কথার মধ্যে কখনও কখনও বড় কার-খানা লুকাইয়া থাকে। ঘাটে তো আর কেহ নাই, তবে মাঝবয়সী স্ত্রীলোক দুইজন কি জন্য চুপি চুপি ইসারায় এমন কথা বলিল, আবার ভয় পাইয়া চুপ করিল?

তাঁতীঘাটে জলে নামিবার পথের মাঝামাঝি হইতে ডান দিকে পনের কুড়ি হাত আন্দাজ তফাতে জোড়া বট আর অশ্বত্থ গাছ গায়ে গায়ে লাগালাগি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাছ দুইটি আধাআধি বড় মোটা-সোটা দেখিতে, তাহাতে আবার কচি পাতায় ভরা। ঘাটের কাছে রাস্তার ধারে বট অশ্বত্থ দুই গাছে বিবাহ দিলে কন্যাদায়ের ফল মিলে। হিন্দুদের এই সংস্কারের চিহ্ন অনেক স্থানে দেখা যায়। স্ত্রীলোক দুইটি কথা বলিতে বলিতে সেই গাছতলার দিকে দুই তিনবার তাকাইয়াছিল। এখন, কথা যায় কোথায়? চোর তো অন্ধকারের রাত্রিতে খুব সাবধানে চুরি করে, জেলখানায় এত কয়েদী কোথা হইতে আসিল? বুদ্ধিমান হুঁশিয়ার গোয়েন্দার চোখে ধুলা দেওয়া সহজ নহে। অবশ্য গাছতলার পদার্থ-বিশেষের সহিত ইহাদের কথার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। ঠিক! আমাদের অনুমান পুরাপুরি ঠিক। সুতার খেইটি হাতে পড়িলে বুদ্ধিমান তাঁতী যেমন একগোছা সুতা সরাসরি টানিয়া আনে, আমাদের সেইরূপ বুদ্ধি-মান জানিবেন, একটু ইঙ্গিত দিয়া সব কথা আমাদের কাছ হইতে শুনিয়া

নিন। জোড়া গাছের পাশে দুইটি স্ত্রীলোক বসিয়া কি বলাবলি করিতেছে। ম'ল যা—ইহাদের যে আমরা ভাল করিয়া চিনি। অসময়ে অস্থানে ইহারা বসিয়া কি কথা কহিতেছে? জোড়ও মিলিয়াছে ভারী চমৎকার। একটি ধূর্তা নষ্টা শৃগালী, আর-একটি ঠিক বিপরীত—নিতান্ত নিরীহ ভেড়ী। দুইজনের মধ্যে একজন নাকবসনী তুলিয়া, সাপিনী যেমন করিয়া ফণা তুলিয়া সাবধানতার সহিত তাকায়, তেমনি করিয়া চারিদিকে তাকাইয়া অনর্গল বক্তৃতা ঢালিয়া দিতেছে। দ্বিতীয়ার কাছে জলের কলসীটা রাখা, ডান হাতে দাঁতন মুঠা করিয়া ধরা, কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা, একটা বিকট শব্দ শুনিলে ভেরী যেমন করিয়া সেইদিকে সন্ত্রস্ত হইয়া চাহিয়া থাকে, তেমনি "স্থির মন ধীর বুদ্ধি পঞ্চভূত আত্মা দুরস্ত নির্মল হৃদকমল"-এ শুকদেবের মুখ হইতে পরীক্ষিৎ যেমন পুরাণ শুনিয়াছিলেন সেইরূপ বাক্যাবলী দ্বিতীয়া স্ত্রীলোক ভেড়ীটি শ্রবণ করিতেছে। কিন্তু সেগুলি তাহার মস্তিষ্ক ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইতেছে কি অন্য কান দিয়া সোজা বাহির হইয়া যাইতেছে তাহা স্থির করিয়া বলিতে আমরা নিতান্ত অক্ষম।

আপনি অবশ্য তাহাদের কথা শুনিতে চাহিবেন সন্দেহ নাস্তি। এক-জন মাতাল বলিয়াছিল—

সংসারবিষবৃক্ষস্য মদ্যমাংসামৃতফলম্।

অর্থাৎ সংসাররূপ বিষবৃক্ষে মদ্য মাংস এই দুইটি অমৃত ফল ফলিয়াছে। এ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মনু বলিলেন—

ন মাংসভক্ষণে দোষে ন মদ্যে—
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং—

অর্থাৎ ভূতগণ বা ভূতের ন্যায় লোকেরা এরূপ কথা বলে। ঠিক কথা, 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্'। কিন্তু সংসাররূপ বিষবৃক্ষে যে দুইটি অমৃত ফল ফলিয়াছে এ কথা সত্য। চিনিবার লোক কই? কেবল আমরা সেই ফল দুইটি জানি। 'পরোপকারম্ স্বর্গায়'। পরের উপকার করা আমাদের ব্রত। আপনাদের উপকারসাধনের জন্য সেই ফল দুইটির নাম প্রকাশ করিতেছি। একটি ফলের নাম গোপন কথা শুনিবার ইচ্ছা, আর-একটির নাম পরনিন্দা। তুমি কারও ঘরের গুপ্তছিদ্রের কথা বল বা কারও নিন্দা কর দেখিবে লোকে ভারী আনন্দে মন দিয়া শুনিবে। বুঝিলেন তো? ফলের মাহাত্ম্য না থাকিলে কি তাহার এত আনন্দ হইত?

আমরা কি লিখিতে গিয়া কি লিখিয়া ফেলিতেছি। নৌকা বাহিবার সময় জলের স্রোত নৌকাকে লক্ষ্যস্থান হইতে দূরে টানিয়া নেয়। কিন্তু

শক্ত মাঝি হাল ছাড়ে না। আমাদের কলম এদিকে ওদিকে যাইতেছে বটে, কিন্তু মূল কথাটার এদিক ওদিক হইবে না—তাহার পথ ধরিয়াই চলিবে।

সে কথা যাক, আপনাকে আর সন্দেহের মধ্যে ফেলিয়া রাখা উচিত নয়। এ দুইটি স্ত্রীলোক কে, কি কি কথা বলিতেছে, সব খোলসা করিয়া বলিয়া দেওয়া উচিত। কোনও কোনও লোক একটা কথা বলিবার আগে অনেক গৌরচন্দ্রিকা, অনেক বক্তৃতা করিয়া বসেন। কিন্তু আমাদের স্বভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যাহা বলিবার পরিষ্কার করিয়া ঝট্‌পট্‌ বলিয়া ফেলি। আর অনেক লোক ভয়ে অনেক কথা লুকান বা কি বলিতে গিয়া কি বলিয়া ফেলেন। এই দেখুন না, মাঝবয়সী স্ত্রীলোক দুইটি ইসারায় কি বলিতে বলিতে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু তাঁতীর মেয়েদের চাইতে আমাদের সাহস ঢের বেশী। বীরের ন্যায় সব কথা বলিয়া যাইব। আর-একটি কথা কি জানেন? আমাদের মত লোকে ডাক পাড়িলেও কেহ শুনিবে না, কিন্তু কোনও মান্যগন্য লোক হাঁ করিলেই দেখিবেন দুই শ' জনে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিবে। বিলাতের লোকে খ্যাতনামা লোকের কথা শুনিবার জন্য ট্যাঁকে পয়সা গুঁজিয়া ছোটে। গাছতলার ঐ স্ত্রীলোক দুইটি গ্রামে সুবিখ্যাত—আপনিও তাহাদের ভাল করিয়া চিনেন। রূপে নয়, গুণেই না মানুষ চেনা যায়। ভাল হউক বা মন্দ হউক সাধারণের নিরিখ হইতে যাহার গুণ যত বেশী সে তত বিখ্যাত। গোবিন্দপুর গ্রামে ন্যূনাধিক এক কাহন স্ত্রীলোক আছে, তাহাদের মধ্যে এ দুইটি বাছাই করা—একটি চতুরতা ও ধূর্ততায়, আর-একটি সরলতা ও নির্বুদ্ধিতায়। দুইটি বিখ্যাত স্ত্রীলোক, তায় আবার গুপ্তকথা, আপনি কি না শুনিয়া ছাড়িবেন? সেইজন্যই না লিখিতে বসিয়াছি।

আমরা বহু পরিশ্রম, বহু যত্ন করিয়া তাহাদের কথা সংগ্রহ করিয়াছি। একটি স্ত্রীলোক ভারী এক লম্বা বক্তৃতা করিয়াছিল। অনেকগুলা কথা শুনিতে আপনার ভাল লাগিবে না, লম্বা কথা লেখায় আমরা অনভ্যস্তও বটে। তাহার সারমর্ম লিখিতেছি।

দেখ শারিআ, মা বুড়ীমঙ্গলা সব কিছুর মূল কারণ, তাঁর আজ্ঞায় পৃথিবী চলছে, সংসারের যত কিছু কারবার হচ্ছে, তাঁর আদেশ কি বৃথা যায়? কত বার-ব্রত করে দেবীর আদেশ পেয়েছ, তোমার খুব ভাগ্য, এত বড় ভাগ্য কারও হয় না। এক কর্তাবাবুর ঘরের উপর দয়া ছিল, আর এই তোমার উপরে হল। তুমি মঙ্গলার মন্দিরটা বানিয়ে দাও তো, দেখবে তোমার ঘর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হয়ে যাবে। পণ পণ, কাহন কাহন টাকা কোথা হতে এসে ঘরে ঢুকবে, সারি সারি ধানের মরাই বসে যাবে।

ভগবান কি আর তাঁত বুনবে? তোমার পিছন পিছন দশজন দাসী ঘুরবে। তুমি মঙ্গলার আদেশ মান, যেমন করে হোক মন্দিরটা বানিয়ে দাও। টাকার জন্য ভাবনা কি? মঙ্গলার নাম শুনলে টাকা কে না দেবে? আর কোথাও কেন খুঁজবে? মঙগরাজের কানে গেলে মাঝরাতে টাকা গুণে দেবে, সে ভার আমার. আমি টাকা এনে দেব, তোমাকে কিছু করতে হবে না। বেশী টাকা দরকার নেই, দেড় শ টাকা হলে খুব একটা বড় মন্দির হয়ে যাবে। কেন্দ্রাপাড়ায় যে বলদেবের মন্দির আছে ঠিক তত উঁচু তত চওড়া হবে। তোমার ছ মাণ আট গুণ্ঠ জমি বন্ধক লিখে দেবে, আমি টাকা এনে দেব। তোমার জমি তোমারই থাকবে, কেবল তমসুকে লেখা হবে। মন্দির বানানো হয়ে গেলে তো তুমিই কত লোককে টাকা দেবে। মা মঙ্গলা কিছু ইঙ্গিত দিয়ে থাকবেন—নিশ্চয় দিয়েছেন। তিনি প্রথমে একটি সোনার টাকা দিয়ে ইচ্ছা জানান—তিনি কি আর রূপোর টাকা দেবেন?

বক্তৃতাকারিণীর কথা যে শারিআ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। সে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়াছিল। পণ পণ টাকা, দেড় শ টাকা। দেড় শ টাকার অর্থ বুঝা তাহার পক্ষে কি সহজ কথা? এক টাকার পয়সা গণিতে হইলে শারিআর সেদিন আর ঘরের বাহির হওয়া সম্ভব হয় না, ভগিআ আর সে দুইজনে কবাটে হুড়কা দিয়া দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে গণিয়া ঠিক করে। যেদিন পাঁচ সিকা কি আঠার আনার কাপড় বিক্রয় হয়, সেদিন তাহার ভাই লোক-নাথিআর কাছে গণাইয়া আনে। আর তাহার ঘরে কিনা আসিবে পাঁচ ছয়জন দাসী—ইহা বিপদ না সম্পদ! মহামুশকিল! ভগিআ কাছে নাই, কি করা যায়? পলাইতে পারিলে রক্ষা। শারিআ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া একবার জলের কলসীর দিকে তাকাইয়া 'চম্পা ঠাকরুন' এইমাত্র বলিয়া চুপ করিল, আর কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু ধূর্তা চতুরা চম্পার কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। তাহার ওষুধ যে কিছু ধরিল না তাহা বেশ বুঝিয়া নিল। আবার শিকার হাত হইতে পলাইবার জন্য ছটফট করিতেছে। অনেকদিন তাকে তাকে থাকিয়া বিড়াল ইলিশ ধরিয়াছে, তাহার হাত হইতে কি সহজে পলাইবে? মন্ত্র বদলানো দরকার।

চম্পা—দেখ শারিআ, টাকা দিয়ে কি হবে, সোনা দিয়েই বা কি হবে? সোনা দানা নিয়ে কেউ স্বর্গে যায় না, আসল কথা ছেলেপিলে। যে ঘরে ছেলে নেই সে ঘর তো দিনদুপুরে আঁধার। বাঁজা হওয়া আঁটকুড়ী হওয়া কি কম পাপ! কর্তাবাবুর বাড়িতে রোজ পুরাণ পাঠ হয়, আমি

শুনি। সেদিন গোঁসাই পুঁথি পড়ে গাইলেন—

যার নাই ছেলেপিলের সুখ
সকালে তাহার না দেখ মুখ।
তিন পোয়াতী সুলক্ষণী
বাঁজা আঁটকুড়ী গ্রাম-নিন্দিনী।
যাহার ঘরেতে ছেলেমেয়ে না হয়
সে রমণী হায় বড় দুখ পায়।

ভাগবত পাঠ কি মিথ্যা? বৃথাই কি সকলে ভাগবতস্থানে গড় করছে? আর দেখ তো, ভোরবেলা তোমার দরজার সামনে দিয়ে লোক চলে না। কেন চলে না? তোমার মুখ দেখবে না বলে। তুমি শুনে থাকবে আমাদের মা ঠাকরুন প্রথমে বাঁজা ছিলেন, এক ঘড়ি বেলা পর্যন্ত আমরা তাঁহার মুখ দেখতাম না। মা ঠাকরুন কেঁদে কেঁদে শেষে মঙ্গলার পুজো দিলেন, দেবীর তোমার উপরে যেমন দয়া হয়েছে, তেমনি তাঁর উপরেও হল। এখন দেখ নাতিনাতনী দেখবার যোগাড় হয়েছে।

শারিআ জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে, সব কথা শুনিয়া তাহার কান ভোঁ ভোঁ করিতেছে। পলাইতে ইচ্ছা, পথ কোথায়? বিড়াল ইঁদুরের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়াছে। দুই চোখে জল ছলছল করিতেছে। কথা বলিতে ইচ্ছা, মুখ ফুটিতেছে না। বহু কষ্টে মুখ খুলিল।

শারিআ—আমি কি করব? লোকে বলে, কর্তাবাবু জমি বাঁধা নিলে আর ফিরিয়ে দেন না।

চম্পা—রাম! রাম! এ কি কথা বললে? মঙ্গলার কাজে টাকা দেবেন, তোমার জমি নেবেন? গাঁয়ের লোকের কথা শোন কেন? এই গোবিন্দপুর গাঁটা বিশ্বের লক্ষ্মীছাড়া। এ গাঁয়ের স্ত্রীলোকগুলো দিনদুপুরে ডুবিয়ে মারবে! তোমার সুখ দেখে তাদের গলা দিয়া ভাত নামছে না। এ গাঁয়ে যে শাক-খেকোকে ফেন-খেকো দেখতে পারে না। তুমি কাউকে কিছু বলো না। আর দেখ, ঠাকুরানীর আদেশ না মানলে চোখ অন্ধ হয়ে যায়, কান কালা হয়ে যায়, মানুষে মরে যায়। গোপীনাথপুরের তিনজন স্ত্রীলোক ঠাকুরানীর কথা না মানায় তিনজনেই এক সঙ্গে বিধবা হয়ে গেল, তুমি কি সে কথা শোন নি?

শারিআ নিশ্চল কাঠের পুতুলটির মত বসিয়া সব কথা শুনিতেছিল, শেষ কথাটা শুনিয়া আর সামলাইতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, 'আমি কি করব? চম্পা ঠাকরুন, আমি কি করব?'

চতুরা চম্পা এখন শারিআর মনের কথা বেশ বুঝিয়া লইল। ওষুধ ধরিয়াছে বুঝিয়া মনে মনে খুব খুশী হইয়া বলিল, 'দেখ শারিআ, তোমার কিছু ভয় নেই। তোমাকে কিছু করতে হবে না, আমি সব করে দেব।'

শারিআ—না, না, আমার কিছু দরকার নেই, তিনি ভালয় ভালয় থাকুন।

চম্পা—কিছু ভয় পেয়ো না, ভগবানের পায়ে কাঁটাটি ফুটবে না। (চম্পা দধিবামনের প্রসাদী মালা ও একটি রসকরা মহাপ্রসাদ শারিআর হাতে দিয়া বলিল) দেখ শারিআ, এই প্রসাদী মালা, এই মহাপ্রসাদ সাক্ষী রইল, আমি তোমার সব ভাল করে দেব। তোমার তিন ছেলে হবে, আর ভগবানের কোটি বৎসর পরমায়ু হবে, কিছু চিন্তা নেই।

শারিআ—আমি কি করব? চম্পা ঠাকরুন, আমি কি করব?

চম্পা—তোমাকে কিছু করতে হবে না, আজ সন্ধ্যাবেলায় ভগবান আর তুমি দুজনে এখানে আসবে, যা করতে হবে আমি করে দেব। আর মঙ্গলাব্রত ধরলে যতদিন মা মঙ্গলার কাজ না হয় দুজনে স্নান করে উপোস করে থাকবে, খালি অল্প অল্প চিড়ে খাবে। তোমরা ব্রতর কথা জান না, সেইজন্য সব বলছি।

তারপর শারিআ গা ধুইতে আস্তে আস্তে দীঘির জলে নামিল। চম্পা খানিকক্ষণ গাছতলায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া চারিদিকে তাকাইয়া হৃষ্ট-চিত্তে জমিদার বাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

আমরা গোপনে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে সেদিন মাঝরাত পর্যন্ত শারিআ জমিদার-বাড়ির ভিতরে ছিল, ভগবান কাছারি বাড়িতে ছিল। তার পরদিন হইতে চারিদিন পর্যন্ত ভগবানকে গাঁয়ের ভিতরে কেহ দেখে নাই। তাহাকে কটকের রাস্তায় লোকে দেখিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ বলে।

১৪ ॥ মন্ত্রণা

হুক্কা হুয়া—হুক্কা হুয়া—হুক্কা হুয়া। শেয়াল ডাকিল, ঠিক মাঝরাতে। মফস্বলের গাঁয়ে ঘড়িঘণ্টা নাই, শেয়ালের ডাক শুনিয়া কত রাত হইয়াছে ঠিক করিলাম। এই প্রাণীগুলি গ্রামের বড় উপকারী। ছোটগ্রামে মিউ-নিসিপাল কমিশনার নাই। গ্রামের মরা কুকুরটি, ইঁদুরটি, বেড়ালটি, আর আর ময়লা জিনিস উঠাইবার ভার ইহাদের হাতে। মাঝরাত, গোবিন্দপুর গ্রাম নিস্তব্ধ, রাত্রি ঝাঁঝাঁ করিতেছে। তেলীপাড়ায় কোনও কাঁচছেলে ওঞা ওঞা ওঞা করিয়া কাঁদিতেছিল। তাহার মা ঘুম চোখে ছেলেকে থাপড়াইয়া থুপড়াইয়া অনেক রকম মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য জিনিস দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া এবং চোর, চৌকিদার, বাঘ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর প্রাণী আসিতেছে এইরূপ ভয় দেখাইয়া এবং ছেলেটি যে বড় ভাল, সে কাঁদিবে না, চুপ করিয়া ঘুমাইবে ইত্যাদি প্রশংসাবাদ করিয়া ঘুম পাড়াইয়া দিয়াছে। মঙ্গরাজের কাছারির আঙ্গিনায় আমাদের গোবরা জেনা আর মউতুনিআ মৌজার চৌকিদার দাস জেনা দুইজন কপাল সমান উঁচু বাঁশের লাঠি দুইখানা মানুষ প্রমাণ লম্বা কুটার মোটা দড়িতে আগুন জ্বালিয়া কাছে ফেলিয়া নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতেছে। বাহিরের লোকে ভাবিবে মঙ্গরাজের কাছারিতে দুইটা শুয়ারই বা চরিতেছে। আমরা সর্বদা সব বিষয়ে সাবধান থাকি, সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া ঠিক খবরটি সংগ্রহ করি; তথাপি প্রথমে আমাদেরও ভুল হইয়াছিল। কিন্তু ভাল করিয়া কান পাতিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে চৌকিদার দুইজনের নাক ডাকার শব্দই এই প্রমাদের কারণ। কাছারির বাহির বারান্দায় তিনজন প্রজা চটাস্ চটাস্ করিয়া চাপড় মারিতে মারিতে গড়াইতেছে। ক্ষুধা চিন্তা মশা ইহাদের সহিত নিদ্রার সতীন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়। প্রজা তিনজন কর্জা ধানের জন্য আটক পড়িয়াছে। সারাদিন দক্ষিণ হস্তের কর্মের সহিত সম্পর্ক নাই, তাহার উপর মশা, তারপর চিন্তা, আর ঘুমের কথা কেন বল?

কাছারির প্রান্তর পার হইয়া ভিতরে যাইবার প্রথম প্রস্থে মঙ্গরাজের শয়ন মন্দির। প্রয়োজন হইলে লোকে তাহাকে তোষাখানাও বলে। বাড়ির সব ঘরের মধ্যে এ ঘরটি শ্রেষ্ঠ হইবার কথা, সে বিষয়ে ত্রুটি হয় নাই। পাঁচ কড়ির ছাউনি করা আটচালা ঘর; পূর্ব দুয়ারী, সামনে

চওড়া বারান্দা। দুয়ারে কাঁঠাল কাঠের জোড়া কবাট, কবাটে তক্তা ঢেরা দিয়া লাগানো, লোহার গজাল মারা। বাহিরের দিকে কড়া ও শিকল দুইই লাগানো, দুইটা বড় বড় নলী তালা দেওয়া হয়। ঘরের পশ্চিম দিকের দেওয়ালে কোমর প্রমাণ উঁচুতে এক বিঘৎ চওড়া কাঠের শিক লাগানো জানালা। অগ্রহায়ণ মাসের বৃহস্পতিবার ঘর লেপাপোঁছা হইলে কদাচিৎ জানালা খোলা হয়। ঘরের চারিকোণে ঘুট ঘুটে অন্ধকার— তোমার আমার পক্ষে দিনের বেলাতে আলো দরকার। ঘরের কোণ-গুলিতে আরসোলা বলে 'আমায় দেখ্', ইঁদুর বলে 'আমায় দেখ্'। বর্ণ সাদৃশ্যহেতুই হোক বা নাম সামঞ্জস্যহেতুই হোক চম্পা বলে "অসরপা* লক্ষ্মী; ঘরে অসরপা থাকিলে অর্সার্পি† আসে," সুতরাং অসরপা বংশ বিনা বাধাবিঘ্নে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ঘরের কোণগুলি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ঘরের উত্তর দিকের দেওয়ালের কোলে একটা বাঁশের মাচার উপরে তিনটা বড় বড় পুরানো বেতের পেঁটরা রহিয়াছে। মাচার নিচে তক্তপোশ, মেঝেয় ঘরের কোণে গুড়ের কলসী, আম্‌সির হাঁড়ি, করমচার তেলের ডিবা তিন চার গণ্ডা। অন্য সব মৌজার বাগান হইতে গাছ-ঝাড়া দিয়া করম্‌চা আসে, তেলী বেগার খাটিয়া পিষিয়া তেল বাহির করিয়া দেয়। সেই তেল তোষাখানায় রাখা থাকে। বছরকার মত তেল কেনায় নিশ্চিন্ত, বরঞ্চ বাঁচে। দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের কাছে দুইটা বড় বড় আমকাঠের সিন্দুক। আর তার কাছে একটা শালকাঠের সিন্দুক। এটা লক্ষ্মীর সিন্দুক, প্রতিদিন চম্পা সন্ধ্যা দেয়। প্রতি বৃহস্পতিবার সিঁদুর চন্দন দিয়া পূজা দেওয়া হয়, আতপ চাল ও গুড়ের ভোগ হয়। আড়া হইতে তিন চারিটা সিকায় ঘিয়ের কলসী ঝুলিতেছে। গোঠ হইতে ভাগের ঘি আসিয়া তাহাতে জমা হয়। সিকা ও আড়া হইতে কালো কালো পালকির থোপনার মত মাকড়শার বাসা ঝুলিতেছে। পশ্চিম দিকের দেওয়ালের কাছে উত্তর দক্ষিণে মঙ্গরাজের বড় তক্তপোশ। দক্ষিণ শিয়রে বড় এক তাকিয়া, হেঁসের‡ উপরে মোটা চাদর। দোহারা করিয়া বিছানা পাতা। চাদরটা দেখিলে হঠাৎ বুটিদার ছিটের কাপড় বলিয়া ভ্রম জন্মে, কিন্তু আমরা ভাল করিয়া দেখিয়াছি যে রক্তকৃষ্ণাভ চিহ্নগুলি মৃত ছারপোকার দেহনিঃসৃত শুষ্ক শোণিত বিন্দু।

* অসরপা ॥ আরসোলা।

† অর্সার্পি ॥ আশরফি।

‡ হেঁস (উচ্চারণ অ-কারান্ত)॥ ওড়িশায় শয্যায় ব্যবহৃত বেনা ইত্যাদি তৃণ-নির্মিত পুরু পাটি।

আজ এই অর্ধরাত্রে সেই তক্তপোশের উপরে একটি পুরুষ ও নিচে মেঝেয় একটি স্ত্রীলোক বসিয়া খুব কথাবার্তায় লাগিয়া গিয়াছে। পাঠক-দের চিনাইয়া দিতে হইবে না। এই স্ত্রী-পুরুষ দুইজন আমাদের চম্পা আর খোদ রামচন্দ্র মঙ্গরাজ। চম্পা তক্তপোশের উপরে দুই হাত ফেলিয়া ঘেঁসিয়া বসিয়াছে, মঙ্গরাজ তাহার দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। তক্তপোশ হইতে তিন হাত দূরে পিতলের একটি পিলসুজ, তাহার উপরে মাটির প্রদীপ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। পিলসুজটির সর্বাঙ্গে তেলের শিটালিপ্ত, পিলসুজের নিচেকার থালায় পোড়া পলিতা মেশা নীল তেল পলাখানেক জমা হইয়া আছে।

চম্পা ও মঙ্গরাজ অনেক রাত্রি পর্যন্ত কি কথাবার্তা কি মন্ত্রণা করিলেন সব কথা শুনিতে আপনার ভাল লাগিবে না। আমাদেরও বেশী লেখা স্বভাববিরুদ্ধ, অথচ এই কথাগুলি সত্য ঘটনা বল, গালগল্প বল, উপন্যাস বল, রূপোন্যাস বল ইহার প্রধান নায়ক নায়িকাদের কথা বাদ দিলে চলিবে না। সুতরাং চারিদিক বিবেচনা করিয়া লিখিবার জন্য 'ভাঁড়ে তেলও থাকুক ছেলের মাথাও রুক্ষ না থাকুক'* এইরূপ করিয়া দিতে হইল।

চম্পা বলিল, 'বাপের ঠিক নেই মায়ের ঠিক নেই, দাগাবাজি করে মুসলমান ছোকরার কাছ থেকে জমিদারি এনে গাঁয়ে বলছে কি না জমি-দার। হলি তো হলি জমিদার তোর নিজের ঘরে; গরু ছেড়ে দিয়ে ক্ষেত উজার, আবার কি না করে গালাগালি? পালিয়ে গিয়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে লুকাল, পড়ত হাতে তো! কর্তাবাবু, একজন নয় দুজন নয়, গাঁয়ের যত লোক সব জমা হয়েছিল। দোকানের বারান্দায় বসে চীৎকার করে গালি পাড়ছিল। আমি পান কিনব কি, দোকানের কাছ থেকে পালিয়ে এলাম। অলপ্পেয়ে, তুই কানা হয়ে যা, খোঁড়া হয়ে যা, ঘাট-জোড়া তুই মর। কর্তাবাবু, আমি কি ছাড়বার পাত্র? আর কেউ হলে তার নাক কামড়ে দিয়ে আসতাম না? কিন্তু মানুষটা অসুরের মত জোয়ান। তার বাঁশের লাঠি দেখে আমার রক্ত জল হয়ে গেল। তুমি এর উপায় কর, নইলে মাথা কুটে মরব, বিষ খেয়ে মরব, জলে ডুবে মরব।' চম্পা এই বলিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মঙ্গরাজ—কাঁদিস্ না চম্পা, কাঁদিস্ না। সেই লাঠিকেই তো আমার ভয়। চার চারটা অসুরের মত, নেহাত মূর্খ। কথায় কথায় লাঠি উঁচিয়ে বসে। আর, সে কাজ তো কবেই সেরে দিতাম। আমাদের একটি

* ওড়িয়া প্রবাদ।

বিড়ালছানাও সে গাঁয়ে গেলে তার উপর কড়া নজর। গোবরা এত চালাক, এত হুঁশিয়ার তাকে দিয়েও তো কিছু হল না। সে কি করবে? দিনরাত লোক পাহারা রয়েছে।

চম্পা—না না কর্তাবাবু, তা হবে না, তুমি এর উপায় কর, নইলে আমি তো গাঁয়ের স্ত্রীলোকদের সামনে মুখ দেখাতে পারব না। ওদেরই বা কি করে এত ক্ষ্যামতা হল। তোমাকে হারাল?

মঙ্গরাজ—দেখ্ চম্পা, শাস্ত্রে আছে: 'মারি ছলে বলে যে কৌশলে, তারে শত্রুতা সাধন বলে'। আমি তো পারলাম না, তুই এর কিছু ফন্দি বার কর, তুই লাগলে সব হবে। দেখ্, আমি তিন বছর ধরে সে তাঁতীর পিছনে লেগে কিছু করতে পারলাম না, তুই যেই হাত দিলি কাজ ফতে।

চম্পা প্রদীপ উসকাইয়া দিয়া খুব এক চোট হাসিল, বলিল—কর্তাবাবু, প্রথমে ভেবেছিলাম পারব না। বুদ্ধি খরচ করলে কি না হয়? সেই ছ' মাণ আট গুণ্ঠ জমিতে কাল লাঙ্গল যাবে তো?

মঙ্গরাজ—আমি মজুরদের বলে দিয়েছি। কাল সকালে সেখানে লাঙ্গল নেবে, কালই দু'বার চষা হয়ে যাবে। আমিও যাব।

চম্পা—ওদের ঘর ভেঙে দিয়ে ভাল করেছ। ঘর থাকলে কখন আবার জমির জন্য হাঙ্গামা করত।

মঙ্গরাজ—জমি ছয় মাসের মেয়াদে বন্ধক ছিল, মেয়াদ যাওয়াতে জমি পেলাম। মোকদ্দমার খরচের জন্য ঘর নিলাম হল, আমি কিনে নিয়ে ভেঙে দিয়েছি।

চম্পা—জমি হোক, ঘর হোক, যাই হোক, সেই গাইটির জন্যই আমি এত করলাম। গাই তো নয়, যেন কুনকী হাতী। আজ কাছারীর বারান্দায় বেঁধে রেখে এসেছি, কাল থেকে বাড়ির ভেতরে বাঁধব। সে দুটা কোথায় গেল?

মঙ্গরাজ—কোন্ দুটো? ভগিআ শারিআ? পিণ্ডি না পাওয়া ভূতের মত এর ছাঁচতলায় তার ছাঁচতলায় ঘুরছে।

চম্পা—সেদিন সকালে শারিআ মা মঙ্গলার সামনে কাঁদতে কাঁদতে মাথা কুটছিল। আমায় দেখে আরও কাঁদিল, আমায় কি যেন বলতে আসছিল, আমি মুখ ফিরিয়ে চলে এসেছি।

তারপর ধড়িবাজ চম্পা ও মঙ্গরাজের মধ্যে অনেক রাত্রি পর্যন্ত কথা-বার্তা হইল। শেষে এমন সাবধানে এমন গুপ্তভাবে বসিয়া মন্ত্রণা হইল যে আমরা কোনমতে তাহার হদিস পাইলাম না। পরস্পরে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। দুইজনে কথায় মগ্ন। এমন সময়

সেই দুইজনের মধ্যে একটি স্ত্রীমূর্তির ছায়া পড়িল। দুইজনে যেন চমকিয়া উঠিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ কথাবার্তা বন্ধ। আগন্তুকা ফোঁস করিয়া একটি নিঃশ্বাস ফেলিলেন। মনে দারুণ কষ্ট হইলে যে নিঃশ্বাস পড়ে ইহা সেই রকম তপ্ত নিঃশ্বাস। সকলে নীরব নিশ্চল কাষ্ঠ প্রতিমার ন্যায় নিঃস্পন্দ, ঘর নিস্তব্ধ।

কিছুক্ষণ পরে মংগরাজ সেই স্ত্রীমূর্তিকে শুধাইলেন, 'কি?' মূর্তি নিরুত্তর।

মংগরাজ পুনর্বার শুধাইলেন, 'কি?' কোনও উত্তর নাই। আবার পূর্বের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস। মংগরাজ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া পূর্বাপেক্ষা উচ্চস্বরে শুধাইলেন, 'কি? কিছু বল না কেন?'

কর্তৃঠাকুরানী—(আগন্তুকা মংগরাজের পত্নী)—অতি ধীরে, অতি বিনয়ে বলিলেন, 'বলছিলাম, রাত হয়েছে, শুয়ে পড়, আর ঐ সব কথা তোলা-পাড়া করো না।'

চম্পা অবজ্ঞাভরে গম্ভীরস্বরে কহিল, 'হুঁ'।

মংগরাজ—আচ্ছা আমি যাচ্ছি, তুমি বাইরে যাও।

চম্পার 'হুঁ' শব্দ কর্তৃঠাকরুনের বুকে শেলের মত বাজিয়াছিল, তাহার পর 'আচ্ছা তুমি বাইরে যাও' কথাটা মাথায় সহস্র বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় লাগিল। চম্পা থাকিবে ভিতরে আমি যাইব বাহিরে? যে সকল ঘটনায় পুরুষের কঠিন মন ভাঙিয়া পড়ে, নারীর কোমল মন তাহা সহজে সহিয়া যায়, সহিষ্ণুতাগুণ নারীর পুরুষের চাইতে অনেক বেশী, তাহারা অনেক সহিতে পারে, কিন্তু স্বামীর অনাদর এবং অবিশ্বাস সতী স্ত্রীর পক্ষে অসহ্য। আবার স্বামীর সাক্ষাতে দাসীকৃত অবজ্ঞা মরণাধিক কষ্ট-কর। তবে উপস্থিত ঘটনা নূতন নয়, চিরকাল সহিয়া সহিয়া অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তথাপি মা-ঠাকরুনের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, মাথা ঘুরিয়া গেল, সমস্ত অংগ অবশপ্রায় হইল। কোন রকমে সামলাইয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বারান্দার পাঁচিল ঠেসান দিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমরা সংবাদ পাইয়াছি সেই রাত্রি হইতে মা-ঠাকরুনের মুখ হইতে আর কেহ কোন কথা শুনে নাই। আর, তিনি লুকাইবার বিশেষ চেষ্টা করিলেও সর্বদা তাঁহার চোখ হইতে জল পড়িতে দেখা গিয়াছে।

চম্পা দমাস্ করিয়া কবাটটা ভেজাইয়া দিয়া আপন জায়গায় আসিয়া বসিয়া বলিল, 'আমাকে কেউ গাল দিয়ে ঝাঁটা মারলেও সইব, কিন্তু তোমাকে কেউ একটা কথা বললে আমার বুকে বড় বাজে। মা-ঠাকরুনের

কথা শুনলে তো? আর কেউ হলে তো তাঁর মুখ দেখত না। শারিআর বেলাই তো সব বুঝেছ, আবার তোমাকে কে বুঝাবে? সারা বছর লাগল, মুঠা মুঠা টাকা ঘর হতে বার হয়ে গেল, কটকে মোকদ্দমা চলল, বাগানের দশ গাড়ি কি বিশ গাড়ি পাথর মা মঙ্গলার স্থানে বয়ে নিয়ে দিলে, শেষে কর্তৃঠাকরুন বলেন কি না শারিআর ছ' মাণ আট গুণ্ঠ জমি ছেড়ে দাও, কি না তার ঘর ভেঙো না।' এই বলিয়া চম্পা হো হো করিয়া হাসিল।

ঘোর নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সেই পৈশাচিক বিকট হাস্য কর্তৃ-ঠাকরুনের কর্ণপটহ ভেদ করিয়া থাকিবে। কিন্তু তখন তাঁহার সে হাসির গভীর অর্থ অনুভব করিবার শক্তি ছিল না।

মঙ্গরাজ ও চম্পার মধ্যে যে কথা হইল তাহা অন্যের অগোচর, কেবল চম্পার মুখের কথা এইটুকু শোনা গিয়াছিল : 'তুমি আমাকে একখানি ডুলি, চারটা ভার সাজিয়ে দাও, দেখবে আমি যদি না করতে পারি নাক কেটে দিও।'

১৫ ॥ বাঘসিংহ বংশ

প্রসিদ্ধ আইন-ই-আকবরী লেখক আবুল ফজল বলেন, ওড়িশায় প্রকৃত ভূম্যধিকারী খণ্ডায়েতরা ছিলেন। বাস্তবিক গজপতির দরবারে খণ্ড বা খড়্গের মুঠ হইতে কলমের ডগা পর্যন্ত সমস্ত রাজকার্য তাহাদের হস্তগত ছিল। বেতনের জন্য তাহারা কোষাঘর হইতে নগদ টাকা পাইত না। ওড়িশার অধিকাংশ ভূমিখণ্ড জায়গীর স্বরূপ পুরুষানুক্রমে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া খাইত। খণ্ডায়েতদের বাহুবলে ওড়িশা বহুকাল পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। মুসলমানেরা তিন বছরের অধিককাল পর্যন্ত বঙ্গদেশ হইতে এদিকে চোরা দৃষ্টিপাত করিতেছিল, কিন্তু সুবর্ণরেখা নদী পার হইতে পারে নাই। পাইকেরা সর্বদা রাজ-দরবারে উপস্থিত থাকিত না। দলপতিরা আপন অধীনস্থ পাইকদের নিয়া এক-একটি চাকলায় বাস করিত। এক-একটি আটচালায় দলপতি-দের বৈঠক বসিত, তার নাম চৌপাঢ়ী। সেখানে কুস্তির প্যাঁচ, তলোয়ার খেলা, তিরন্দাজি এবং গুলি ছোঁড়া এই চার বিদ্যার চর্চা হইতে বলিয়া তাহার নাম চৌপাঢ়ী ছিল। গজপতি বংশের পতনের পর টোডরমল তাঁহার বন্দোবস্তে বড় বড় চৌপাঢ়ীগুলিকে কেল্লা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। ওড়িশার অনেক স্থানে আজ পর্যন্ত নামমাত্র ছোট ছোট চৌপাঢ়ী দেখা যায় এবং প্রাচীন দলপতিদের অযোগ্য বংশধরেরও অভাব নাই।

আমাদের বাঘসিংহ বংশ পূর্বোক্ত দলপতিদের একজন বংশধর। ইঁহাদের পদবী মল্ল, জ্যেষ্ঠপুত্রের উপাধি বাঘসিংহ, তিনি জায়গীরের উত্তরাধিকারী। অন্য পুত্রেরা মাসোহারা পান। 'ডাঙ্গা ভুঁইয়ে গাব বৃক্ষ'*। বাঘসিংহ বংশ সামান্য জায়গীরদার হইলেও মফস্বলে নাম ডাক ছিল। রতনপুর মৌজায় চৌপাঢ়ী, তাহা নিষ্কর খণ্ডায়েতী মহাল। তা ছাড়া তালুক ফতেপুর সরষণ্ড এবং কয়খানি বাজে-রিপোর্ট† জমিদারি ছিল। নটবর ঘনশ্যাম বাঘসিংহ সব জমিদারি উড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। লোকটি ভারী বেহিসাবী ছিলেন। আগুপিছু ভাবিয়া খরচ করিতেন না। হাতে কিছু নাই তো নাই, যদি কিছু আসিল অমনি দে খরচ করিয়া। চক্ষু

* ওড়িয়া প্রবাদ। অর্থাৎ, বন গাঁয়ে শেয়াল রাজা।

† রিপোর্ট অর্থাৎ সরকারকে দেয় রাজস্ব। ইংরাজ সরকারের বন্দোবস্তের আগে হইতে যে সকল জমিদারি ছিল তাহার বর্গফল মাপিয়া কতকগুলি অতিরিক্ত জমি বাহির হইল। এই গুলিকেই ওড়িশায় বাজে-রিপোর্ট জমিদারি বলা হয়।

লজ্জার মাথা খাইয়া কোনও কিছু কেহ চাহিয়া বসিলে না কখনও বলিবেন না। দীনদরিদ্রের জন্য দুয়ার খোলা। ভাতের হাঁড়ি চড়াইয়া দিয়া টুকরি হাতে নিয়া তাঁহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে লোকে ভরসা পাইত। খাইতে ও খাওয়াইতে খুব পটু ছিলেন। গাঁয়ের লোকে বলে, বাঘসিংহ সামনে বসিয়া থাকিয়া একবার যাহাকে সরুচাকলি, নারিকেলের পুর দেওয়া মণ্ডা, পালোর পায়স খাওয়াইয়াছেন তাহার আজীবন মনে থাকিবে। নটবর ঘনশ্যামের বহু দেনা ছিল, জমিদারি তাঁহার সংগেই গিয়াছে, থাকার মধ্যে কেবল খণ্ডায়েত মহাল। নটবর ঘনশ্যাম বাঘসিংহের চার পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভীমসেন বাঘসিংহ, অন্য তিন পুত্র—প্রহ্লাদ মল্ল, কুচুলি মল্ল, বলরাম মল্ল। ছেলেরা বাপের মত উড়নচণ্ডে নহেন, চারিদিকে নজর রাখিয়া চলেন। আগেকার সম্পত্তি নাই, সুখে দুঃখে এক রকম করিয়া দিন কাটিয়া যায়। পাট কাপড় ছিঁড়িলেও পাটের নেকড়া, পুরানো ঘর বলিয়া সকলে মান্য করে, ভয় ভক্তি করে। রতনপুর মৌজায় বাঘসিংহের ঘর বাদে গয়লা, নাপিত, রাঢ়ী* ও ময়রা বাপভাইয়েরা আঠার ঘর। ইহারা বাঘসিংহের পূর্বপুরুষের দেওয়া জায়গীর পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে। দরকার পড়িলে বাঘসিংহের ঘরে বেগার খাটে। পুরোহিতের ঘরও এই গাঁয়ে। ইহারা বাদে ডোম আট ঘর, পালপার্বণে বাজনা বাজাইবার জন্য ইহাদের জায়গীর আছে। বাঘসিংহের ঘরে পাহারা দেওয়া আর-একটি কাজ। আজ তিন বৎসর হইল নানা কারণে মংগরাজের সহিত বাঘসিংহ বংশের তুমুল ঝগড়া লাগিয়াছে। মংগরাজ খুব বুদ্ধিমান, মামলা মোকদ্দমায় খুব জাঁহাবাজ, কিন্তু লাঠির নাম শুনিলে ঘর হইতে বাহির হন না। এদিকে বাঘসিংহ বংশ বলেন 'লাঠি সর্বার্থ-সাধিকা'। বিশেষ ডোমদের ভয়ে মংগরাজের লোক রতনপুরের কাছে ঘেঁসিতে পারে না। কিন্তু ডোমেরা খিড়কিতে চোরাই মাল পুতিয়া রাখিবার অপরাধে জেলে গিয়াছে। লোকে বলে, ডোমেরা কোনও পুরুষে চুরিবিদ্যা জানে না, মংগরাজের ইহাতে দুই থলি টাকা খরচ। মংগরাজের ছাড়া গরু রতনপুর মৌজার ফসল উজাড় করায় সেদিন বলরাম মল্ল গোবিন্দপুর মৌজার দোকানের বারান্দায় বসিয়া মংগ-রাজকে আচ্ছা করিয়া দু' কথা শুনাইয়া দিলেন। মংগরাজের মুখে কথা সরিল না। গোবিন্দপুর হইতে রতনপুর দুই ক্রোশ তফাতে, কিন্তু দুই মৌজার ক্ষেত পরস্পরের লাগাও। মংগরাজের গরু সর্বদা রতনপুর মৌজার ফসল খাইয়া যায় বলিয়া শোনা যায়।

* রাঢ়ী॥ ওড়িশার জাতিবিশেষ, ব্যবসায় চিড়া কোটা।

১৬॥ টাঙ্গীর মাসী

আজ স্নানপূর্ণিমা। জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন, বেজায় রোদ। মহাপ্রভু অণসরে* যাইতেছেন, ভারী গুমট। আজ আড়াই মাস হইল এক ফোঁটা জল দেখা যায় নাই। বাতাস থমথমে হইয়া রহিয়াছে। ঠুঁটা গাছগুলা যেন জগন্নাথ মহাপ্রভুর সম্মুখের গরুড়স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া আছে। অন্য গাছের কথা ছাড়িয়া দাও, অশ্বত্থ পাতারও খস্ করিয়া শব্দটুকু নাই। রাস্তার বালিতে এক মুঠা ধান ফেলিয়া দিলে পড় পড় করিয়া খই ফুটিয়া যাইবে। গাঁয়ের কালো ছিটওয়ালা কুকুরটা পুকুরের পাঁকের মধ্যে পেট দিয়া পড়িয়া আছে, আর আধ হাত লম্বা জিভ বাহির করিয়া হাঁপাইতেছে; জলের কাছে যাইতেছে না। জল তাতিয়া গিয়াছে বুঝি? মাঠে একটাও গরু বাছুর নাই, গাছতলায় শুইয়া বৈষ্ণবে যেমন হরিনামের ঝুলি লইয়া জপ করে তেমনি করিয়া চক্ষু বুজিয়া মুখ পাকলাইতেছে। আকাশে একটিও কাকচিল ওড়ে না, পাতার মধ্যে লুকাইয়া হাঁ করিয়া বসিয়া আছে।

কাঠফাটা রোদ। বেলা তিন প্রহর গড়াইয়া গিয়াছে, তবু আকাশ হইতে আগুন ঝরিতেছে।

হুঁ মেরা ভাইরে হুঁ হুঁ†
খবরদার রে হুঁ হুঁ
জোর করি রে হুঁ হুঁ
ডাহানে‡ ধর রে হুঁ হুঁ
বাঁআকু§ ছাড় রে হুঁ হুঁ
খড়পা খড়পা খড়পা¶—

* অণসর॥ স্নানপূর্ণিমার পর পনের দিন পর্যন্ত মহাপ্রভু জগন্নাথের যাত্রীদিগকে দর্শন দিবার অবসর থাকে না (কারণ স্নানের ফলে রং উঠিয়া যাওয়ায় মহাপ্রভুর সর্দি হইয়াছে এইরূপ বলিয়া আবার রং চড়ানো হয়), এই সময়টাকে অণসর (অর্থাৎ অনবসর) বলা হয়। সময়টা গুমটের জন্য প্রসিদ্ধ।

† বেহারাদের বোলগুলি তরজমা না করিয়া মূল ওড়িয়ায় যাহা আছে হুবহু তাহাই রাখা হইল।

‡ ডাহানে॥ ডাইনে।

§ বাঁআকু॥ বাঁয়ে।

¶ খড়পা॥ পায়ে কাঁটা ফুটিল, থাম।

রতনপুর মৌজার গ্রাম্যপথে বেহারার ডাক শুনা গেল। আগে আগে একটি ডুলি আর তার পিছন পিছন ভার লইয়া পাঁচজন ভারী চলিয়াছে। ডুলি মোটা চাদরে আগাগোড়া ঢাকা। গ্রামের পুরুষেরা প্রায় কেহ নাই, ক্ষেত-খামারের কাজ না থাকায় বাঘসিংহ ও তাঁহার ভাইয়েদের সহিত কেন্দ্রাপাড়ায় বলদেবের স্নানযাত্রা দেখিতে গিয়াছেন। গাঁয়ের এ মুড়া হইতে ও মুড়া পর্যন্ত সাড়া পড়িয়া গেল—কাহার ডুলি আসিল। বুড়ী ও আধবুড়ী স্ত্রীলোকেরা দুড়দাড় করিয়া কবাট খুলিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। বউয়েরা দরজা অর্ধেক মেলিয়া মুখটি বাহির করিয়া নাকবসনী* প্রদর্শন করিতে লাগিল। গাঁয়ের স্ত্রীলোকদের মধ্যে পাল্কি-যাত্রীর সম্বন্ধে নানা তর্ক উপস্থিত হইল। প্রথমে লিঙ্গ বিচার, পরে ব্যক্তি বিনির্ণয়। কেহ বলিল নূতন বউ, কেহ বলিল জমাদার, কেহ বলিল সাহেব। জেমার মা অকাট্য যুক্তি দেখাইয়া বলিল—আজ স্নান-পূর্ণিমা, জমাদার সাহেব আনাজের ভার লইয়া বাড়ি যাইতেছেন। ডুলি বাঘসিংহদের চাতালের কাছে মোড় না ফিরিলে জেমার মার অনুমান সিদ্ধান্তে পরিণত হইবার খুব সম্ভাবনা ছিল। বেহারারা বাঘসিংহের দেউড়িতে ডুলিটা দুম করিয়া নামাইয়া দিয়া গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে বসিল। গায়ে দর দর করিয়া ঘাম ছুটিতেছে, বাঁ হাতের তেলোয় মুখের ঘাম মুছিয়া মুছিয়া ফেলিতেছে। বাড়ির ভিতরে খবর গেল নূতন বউয়ের মাসী আসিয়াছেন। গেল মাঘ মাসে বাঘসিংহের পুত্র চন্দ্রমণির সহিত ডালিযোড়ার ফতেসিংহের কন্যার বিবাহ হইয়াছে। এই ডুলি যে সোজা ডালিযোড়া হইতে আসিল বিনা ব্যাখ্যায় তাহা বুঝিতে গ্রামের বুদ্ধিমতী নারীকুলের পক্ষে অসুবিধা হইল না। মাণিক-অ নাপিতানী মা-ঠাকরুণদের খবর দিতে ভিতরে ছুটিল।

আমাদের মাণিকর নাম শুনিয়া থাকিবেন—নচেৎ শোনা আবশ্যক। ইহাকে নাপিতানীমাত্র বলিয়া ভাবিবেন না। বুদ্ধিতে চতুরতায় গুণে অনেক পুরুষের কান কাটিতে পারে। গ্রামের সকলে ইহাকে ভয় করে। বুড়ীরা পর্যন্ত গুরুতর বিষয়ে ইহার নিকট পরামর্শ লইয়া কাজ করিয়া থাকে। মন্ত্রতন্ত্রে ইহার সামনে কেহ দাঁড়াইতে পারে না। গাঁয়ের কচি-ছেলের দৃষ্টি লাগিলে ফুঁকিয়া উড়াইয়া দেয়। দাইপনায় খুব দড়, বউঝির ব্যথা উঠিলে আঁতুড় উঠা পর্যন্ত পোয়াতির কাছ ছাড়া হয় না। শিকড়-বাকরও ঢের জানা। পরের উপকার করিতে যেরূপ আগুয়ান, গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিতেও সেইরূপ মজবুত। ঝগড়া করিতেছে তো সেদিন

* নাকবসনী॥ ওড়িয়া নারীর লঙ্কাকৃতি নাকছাবি।

স্নান করা না হয় নাই হইল। কাহারও অসুখ করিলে মাণিককে দুইটা মিষ্ট কথা বলিলে না খাইয়া না শুইয়া সারারাত বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতে থাকিবে। বিবাহে পুনর্বিবাহে ডাক বা না ডাক মাণিক উপস্থিত, বল বা না বল সব কাজ করিয়া ফেলিবে। মাণিক না জানে এমন কথা নাই। কটকের কথা, সাহেব বাড়ির কথা, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের কথা ইত্যাদি সকল কথা গ্রামের মেয়েরা মাণিকর মুখ হইতেই শুনিতে পায়। মাছ বিনা পুকুর থাকিতে পারে, কিন্তু নিন্দুক বিনা গ্রাম নাই। কেহ কেহ বলে মাণিকটা পেট-আলগা, মিথ্যুক, আষাঢ়ে গল্প ফাঁদিতে পটু। ইহার তিন পুরুষে কেহ গাঁয়ের চৌহদ্দি ডিঙগায় নাই, কটকের কথা, সাহেব বাড়ির কথা কোথা হইতে জানিল? বাঘসিংহের বাড়িতে মাণিকর ভারী খাতির। সহস্রবার কথিত শতবার শ্রুত রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র সওদাগরপুত্র কোটালপুত্র চারজন মিলিয়া বিদেশযাত্রার কথা, করলেই দেবীর কথা, নদীর ওপারের মা মঙগলার কথা, ইত্যাদি কাহিনী শুনাইবার জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঠাকরুণদের কাছ হইতে তলব আসে। রামরাবণের যুদ্ধের কথা মাণিক মুখে মুখে বলিয়া যায়। যাহা জিজ্ঞাসা কর জবাব নিশ্চয় পাইবে; কিন্তু একটি কথা—সে যাহা বলিবে তাহাতে সায় দিয়া যাইতে হইবে। যদি বল, তা তো নয়—আর যাইবে কোথায়? সে কথা যাক, 'স্বনামা রমণীধন্যা।' মাণিককে গ্রামের সকলেই ভাল করিয়া জানে, আমাদের চিনাইয়া দিবার আবশ্যক নাই।

ডুলি যখন মাঝ রাস্তায় ছিল তখনই পিছন পিছন যে নাপিত আসিতেছিল মাণিক তাহার সহিত কথাবার্তা কহিয়া হাল বুঝিয়া ফেলিয়াছিল, এখন বাঘসিংহের দেউড়ি হইতে শোর তুলিয়া বাড়ির ভিতর ছুটিল। 'বড় মাঠান, ছোট মাঠান, মেজ মাঠান, দৌড়ে আসুন, কোথায় আছেন? ডালিযোড়া হতে বেয়ান ঠাকরুনের ডুলি এসে সেই প্রহরখানেক থেকে দেউড়িতে বসে আছে। বেয়ান ঠাকরুনের আসার কথা আমি চারদিন হল শুনেছি, আপনাদের বলতে ভুলেছি। তিনি কাল ডালিযোড়া থেকে বেরিয়েছেন। আমি বলি এত দেরী কেন হল? ডালিযোড়া হতে আসবার পথে যে বড় পুকুরটা আছে সেইখানে স্নান ধ্যান সারতে দেরি হয়ে গেল।' বাঘসিংহের বাড়ির চার জায়ে একত্র হইয়া মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল। তাহার অর্থ অভ্যাগতা অনাহূতা বৈবাহিনী সম্বন্ধে কর্তব্য কি? তা মাণিক একেবারেই মীমাংসা করিয়া দিল: 'শীঘ্র গিয়ে বেয়ানকে আগ বাড়িয়ে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসুন।'

বাঘসিংহদের দেউড়ির ভিতর হইতে ফুলগুণা* ও বসনী† শোভিত দুই তিনটি নাক দৃষ্ট হইল। মাসী ডুলি হইতে নামিয়া পড়িয়া দুপ দুপ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। 'বেয়ান বেয়ান' বলিয়া উক্ত নাসিকা-ধারিণীদের সহিত এক প্রস্থ গলাগলি করিলেন। গৃহাধিষ্ঠাত্রী ঠাকু-রানীরা স্মিত মুখে বেয়ানের হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। বেয়ানের অভ্যর্থনায় মাণিকর উদ্যোগ অনুষ্ঠান বেশী। সে আগে আগে দৌড়িয়া গিয়া বাঘসিংহের শুইবার ঘরের সামনের আঙিনায় একটা চার হাত লম্বা পুরানো গালিচা পাতিয়া দিল। মাসী তাহাতে বসিয়া চার বেয়ানের হাত ধরিয়া কাছে বসাইলেন। পাঁচ ভারে যে তত্ত্ব আসিয়াছিল মাঝের আঙিনায় রাখা হইল। তত্ত্ব এইরূপ—পাকা আম এক ভার, বড় বড় দুইটা খাজা কাঁঠাল এক ভার, পাকা কলা ও কাঁচকলা দুই কাঁদি আর দুই ছড়া সমেত এক ভার, পিটালি গোলা দিয়া খড়ি পড়ানো কলাপাতা দিয়া মুখ বাঁধা বড় বড় চার হাঁড়িতে দুই ভার। গ্রামের রমণীকুল দেখিতে ছুটিল : রেবতী, শুকুরী, শঙ্করী, মালিআ, জেমার মা, ভীমের মাসী, হগুরার মা, সোদরী, মেঙ্কী, কনক, নেতর আই, সাবী, কমলী, পদি দিদি, শামার বউ, ললিতা, বিঙ্কা, সুমিত্রা, গোয়ালাদের কনে বউ; কেহ ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ছেলের হাত ধরিয়া হাঁটাইয়া, কেহ আর কাহারও পিছনে, কেহ একাকিনী ছুটিয়াছে। শঙ্করার মা ঘর লেপিতেছিল, গোবর জলের হাত ধুইবার সময় নাই, সাপের ফণার মত হাতটা তুলিয়া আছে। বাঘসিংহদের আঙিনা ভরিয়া গেল, দেবী প্রতিমা দেখার মত স্ত্রীলোকেরা একদৃষ্টে মাসীর রূপমাধুরী হৃদয়ঙ্গম করিতেছে। কিন্তু বনিআ, বঙ্কিআ, কালিআ, বনমালিআ, গোপালিআ, রামিআ, উমেশিআ, কাশী, দৈত্যারি প্রভৃতি গ্রামের দুষ্ট ছেলেগুলা মাসীর সৌন্দর্য দর্শনে মনোযোগ না করিয়া বিড়াল যেমন করিয়া শুঁটকী মাছের খালুইয়ের দিকে তাকায় তেমনি করিয়া তত্ত্বের পাকা কলা পাকা আমের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। ইহা যে অসভ্যতা ও নীতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আর তাহাদিগের বৃত্তরেখা ক্রমশঃ যেভাবে সংকুচিত হইয়া আসিতেছিল বুদ্ধিমতী মাণিক তাহাতে প্রচ্ছন্ন অসদভিপ্রায় উপলব্ধি করিয়া ঈষৎ তর্জ্জনপূর্বক ডান হাত নাড়িয়া তাহাদের অপসারিত করিয়া না দিলে একটা লুটতরাজের মামলা ঘটিয়া যাইবার খুব সম্ভাবনা ছিল।

* ফুলগুণা॥ ওড়িয়া রমণীর নাকের এক পাশে পরিবার বড় ফুলের নক্সা করা নাকছাবি।

† বসনী॥ ওড়িয়া নারীর লঙ্কাকৃতি নাকছাবি।

বউয়ের মাসীর মাথায় মা মঙ্গলার মত এক ধেবড়া সিঁদুর, চোখে কাজল, নাকে গুণা*, তার উপরে নাটময়ুরা† বাঁ নাকে বসনী, দুই কানে বড় বড় দুইটা কাপঅ‡, গলায় চিক, তাহার নিচে মুগার সুতায় গাঁথা গিনির মালা, বাহুতে বিদ-অ§, হাতে পৈছা, তাহার উপর রূপার শাঁখা, তাহার উপর চুড়ি, হাতের পাঁচ আঙ্গুলে নাম লেখা সাতটা আংটি, পায়ে চব্বিশ ভরি ওজনের দুইটা কাঁসার বাঁকমল, পায়ের দশ আঙ্গুলে ঘুঙুর দেওয়া আঙ্গট। মাথায় দশ বার গোছা থুর্পান দিয়ে বাঁধা বিশাল খোঁপা, তাহার উপর তিনটা ঘুঙুরে তিন নরী শিকলি দেওয়া মাথার কাঁটা গোঁজা রহিয়াছে, কুম্ভপাড় ষোলহাতী বহরমপুরী পাটের শাড়ি পরনে, গালে পান ঠাসা। ডালিযোড়ার ফতেসিংহেরা অবস্থাপন্ন ঘর আগে হইতে কানে শোনা ছিল, এখন গহনার ঘটা চোখে দেখিয়া গাঁয়ের নারীসমাজ বুঝিলেন—হাঁ, একটা ঘরের মত ঘর বটে।

মাসী বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, 'আমার বোনঝি কই গা, আমার বোনঝি কই? আমার বোনঝিকে দেখব। আহা, মা-মরা মেয়ে, হয়তো শুকিয়েই গিয়েছে।' ছোট খুড়শাশুড়ী নূতন বউকে লইয়া আসিলেন। বউটি দেড়হাত ঘোমটা টানিয়া অল্প নুইয়া আসিয়া মাসীর পায়ে ঢিপ করিয়া একটি প্রণাম করিল। মাসী বোনঝিকে জড়াইয়া ধরিয়া বিনাইয়া কাঁদিতে বসিলেন : 'অ আমার মেয়ে—তোকে না দেখে অন্ধ হয়েছিলাম। ওরে আমার চাঁদমুখী লো, আমার ঘর আঁধার করে এসেছিস, অ আমার কালো মাণিক লো।' মাসী বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অস্থির হইয়া গিয়াছেন, দুই চোখ হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। বড় বেয়ান গলা জড়াইয়া ধরিয়া আপনার আঁচলে চোখ মুছাইয়া দিলেন এবং অনেক রকমে বুঝাইয়া সুঝাইয়া শান্ত করিলেন। মাসী বলিলেন, 'কি বলছ বেয়ান, মেয়ে যেদিন থেকে এসেছে সেদিন থেকে অন্নজল তেতো হয়ে উঠেছে। কেবল পথের দিকে চেয়ে বসে থাকি, এদিক থেকে লোকটি গেলে শুধাই, জনটি গেলে শুধাই।'

বোনঝি তো নূতন গলা শুনিয়া ও বিনাইয়া কাঁদা দেখিয়া তটস্থ। মাসীর মুখ দেখিবার জন্য একটু ঘোমটা তুলিতেছিল, চতুর মাসী বোনঝির অভি-প্রায় সহজেই বুঝিতে পারিয়া ঘোমটাটা আবার টানিয়া দিয়া বলিলেন, 'অ

* গুণা ॥ ওড়িয়া নারীর বর্তুলাকার নাকছাবি।
† নাটময়ূর ॥ ওড়িয়া নারীর নৃত্যরত ময়ূরের আকৃতি-বিশিষ্ট নাকছাবি।
‡ কাপ (উচ্চারণ অ-কারান্ত) ॥ ওড়িয়া নারীর বড় কানপাশার ন্যায় অলঙ্কার।
§ বিদ (উচ্চারণ অ-কারান্ত) ॥ ওড়িয়া নারীর দক্ষিণ বাহুর অলঙ্কার।

আমার লাজুকমুখী রে, ওরে আমার লজ্জাবতী লতা রে, তোকে কে লজ্জা শেখাবে রে! কি বলব বেয়ান, এর মায়ের এই রকম লজ্জা ছিল। বুড়ি হয়ে মরল, শাশুড়ীদের সামনে চোখ তুলে চায়নি, ঘোমটা তোলেনি। শাশুড়ীর সঙ্গে খিটির মিটির হয়ত লাগাবে, খুড়শাশুড়ীদের গালি হয়ত দেবে, কিন্তু সেই ঘোমটার ভিতর থেকে। ধানের পেট হতে কি আগাছা বার হয়? তুলসীর বীজ হতে কি বিছুটি হয় সোমত্ত মেয়ে হয়ে যদি লজ্জা না হল তবে ধিক তার জীবনে, তার কথা ছেড়ে দাও।' বোনঝি তো মাসীর কথা শুনিয়া আরও ঢাকাঢুকি দিয়া জবুথুবু হইয়া বসিয়া রহিল। টাঙ্গীতে তাহার এক মাসীর বাড়ি আছে বলিয়া শুনিয়াছিল, সে তাহার মায়ের খুড়তুত ভগিনী। মনে ভাবিল এ সেই মাসী।

তাহার পর বউয়ের মাসী হাসিতে হাসিতে বেয়ানদের সহিত কথাবার্তা কহিলেন। বেয়ানে বেয়ানে কথা, হাসি মস্করা, ঠাট্টা তামাশা ঢের হইল। আপনার সে সমস্ত কথা শুনিবার ইচ্ছা থাকিতে পারে, কিন্তু ভাল মানুষের বাড়ির বউঝিদের কথা প্রকাশ করিতে আমরা নিতান্ত নারাজ। তবে আপনি যদি সেকথা শুনিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হন, তবে যাহা বলিলে কোনও দোষ নাই ততটুকু বলিতে পারি। বউয়ের মাসী বলিলেন :

'এ বছর ভারী যোগ পড়েছে, সকলেই বলদেবের যাত্রা দেখতে ছুটেছে। আমাদের গাঁয়ের তো জনমনিষ্যি নেই। আমি বলি, ভাল সময় এসেছে, ঠাকুর দেখা বেয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ এক সঙ্গে হয়ে যাবে। বোনঝিটি কেমন আছে তাও দেখব। সকলকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বাড়ির বার করলাম। আমাদের তেনারা—আর ভগ্নীপতি মশায় এক একটা ঘোড়ায় চড়ে সোজা গিয়ে আমবাগানে বসে আছেন। নাপিত বেহারা সকলে তাঁদের সঙ্গে। আমি বললাম, মেয়েকে না দেখে যাব না—একাই চলে এলাম। কাল ঠাকুর দর্শন সেরে সকলে এই পথেই ফিরব। পথে শুনলাম বেয়াইরা যাত্রা দেখতে গেছেন। ভালই হল, সকলে একসঙ্গে আসব। দেখ বেয়ান, তোমাদের সঙ্গে সুখ দুঃখের কথা, হাসি তামাশার কথা কিছু হতে পারল না। ফিরবার সময় এখানে চারদিন থেকে যাব। বোনাই মশায় বলছিলেন কেবল একদিন থাকবেন। দেখুন দেখি, কি করে চারটি দিন না থাকবেন, ট্যাঁকে টান পড়বে বুঝি!' বোনঝির মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, 'মা গো, মেয়ে গো, আহা! ছেলেমানুষ, কে জানে চিনতে পারবে না কি, কতদিন হল দেখিস্ নি। আমি ফিরে আসি, নিরিবিলিতে বসে অনেক কথা কইব।' কানে কানে বলিলেন, 'তোর জন্য যাত্রা থেকে অনেক জিনিস আনব।'

বউয়ের মাসী খিড়কির দিকে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'দেখ বেয়ান, আমি পুকুর পাড়ে গেলে স্নান করি, চার বারও গেলে চার বারই স্নান। বাড়ির পিছনে গেলে এক ঘটি জল। 'আচারে লক্ষ্মী বিচারে পণ্ডিতা'।' এই বলিয়া সদর দরজায় ডুলির কাছে দুপ দুপ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সঙ্গের নাপিত আগে হইতে ঘটি লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বউয়ের মাসী জল পড়িয়া যাইবার ভয়ে ঘটির মুখে হাত দিয়া ঢাকিয়া খিড়কির দুয়ারে চলিয়া গেলেন। বাঘসিংহের বাড়ীর দাসী মুতুরীর মা ছাঁচতলা দেখাইয়া দিয়া খিড়কির দুয়ারে দাঁড়াইয়া রহিল। বউয়ের মাসী তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'দেখ সকাল থেকে বেগ আসছে, কি করব চারদিকে লোক—পুরুষ হোক স্ত্রীলোক হোক কেউ তাকালে আমি বসতে পারি না।' মুতুরীর মা বলিল, 'না না, এখানে কেউ নেই, আপনি যান, আপনি যান।' এই বলিয়া ভিতরে আসিয়া খিড়কির দুয়ার ভেজাইয়া দিল।

অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, বউয়ের মাসী বলিলেন, 'আমি আর থাকতে পারব না, তেনারা পথ চেয়ে বসে আছেন।' বেয়ানরা কিছু খাইতে বলিলেন। মাসী জিভ কাটিয়া বলিলেন, 'রাম-রাম-রাম! কি বললে বেয়ান, কি বললে? এ বাড়িতে মেয়ে দিয়েছি, জলস্পর্শ করব?' বিদায় কালে বউয়ের মাসী বেয়ানদিগকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন :

দাও গো মেলানি যাই হে সাঙ্গাত
মনটি রাখিলে বান্ধিয়া।
দিন রাতি মোর ফুরাইবে না ত
গুমরি কান্দিয়া কান্দিয়া॥

ডুলি গাঁ হইতে বাহির হইয়া মাঠের অন্ধকারে মিশিয়া গেল। এদিকে কর্তাবাবুদের দেখিবার জন্য তত্ত্ব রাখিয়া দেওয়া হইল। বউয়ের মাসী বিদায় হইবার পর তাঁহার রূপ গুণ সম্বন্ধে বহু সমালোচনা হইল। সকলেই প্রশংসা করিল, কেহ রূপের, কেহ গুণের, কেহ গহনার, কেহ পাকা কলার। কিন্তু মাণিক বলিল, তা না হয় হইল—বড় লোকের ঘর, রূপটা কিন্তু সে রকম নয়, সামনের দাঁত দুইটা বেয়াড়া, গাল দুইটা যেন চালতাচেরা। হগুরার মা বলিল, কথাগুলি মিষ্ট নহে, কটকটে। মুতুরীর মা বলিল, চলনটা গটগটে। শঙ্করী বলিল, হাঁ হাঁ, হাসিটা খটখটে। শুকুরী বলিল, চাউনিটা কটমটে। এমনি করিয়া এক দোষে সমস্ত গুণের সন্নিপাত হইয়া গেল। নূতন বউকে মাসী সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করা হইল, কিন্তু সে কেবল বলিল—'টাঙ্গীর মাসী।'

১৭ ॥ কিরূপে ঘর পুড়িল

আজ অনন্তপুর গ্রামে হাহাকার পড়িয়াছে। কাল মাঝরাত হইতে বাঘসিংহের বাড়ি আগুন লাগিয়া সমস্ত বাড়ি, ধানের গোলা পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে। দেওয়ালগুলা ভস্ম ও অঙ্গার মাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এখনও আগুন নিবে নাই। ঘরের ভিতরে চাল ধসিয়া গিয়া ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে। বাঁশের গাঁট ফট্ ফট্ করিয়া ফুটিতেছে। কোথাও দেওয়ালের উপরে দুইটা বাঁশ, কোথাও খানিকটা খড় জ্বলিতেছে। মোটা মোটা থামগুলি অগ্নিস্তম্ভের ন্যায় দেখাইতেছে। কবাটে আগুন, চৌকাঠে আগুন, চারিদিকে আগুন। গোলাঘরের ভিতরে আগুন ঢুকিয়া বড় ধুঁয়া বাহির হইতেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন, ঘরের চাল বেড়া শুকাইয়া ধুনা হইয়া ছিল, কাছে যাইবার সাধ্য কাহার? বাতাস এই সময় কোথায় ছিল হু হু করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কেবল ছাদ ও চালের মাঝখানে মাটি থাকায় ভিতরে আগুন যাইতে পারে নাই, কবাট ধরিয়াছে। ক্ষেতমজুরেরা কলসি কলসি জল ঢালিয়া ঘরের দরজার কাছে যাইবার চেষ্টা করিতেছে। যাহারা যাত্রা দেখিতে গিয়াছিল ফিরিয়া আসিয়াছে। বেলা দুপুর—নিচে আগুন, উপরে আগুন, ঘর হইতে কুটা এক গাছিও বাহির হয় নাই। মাঝরাতে আগুন লাগিল, স্ত্রীলোকেরা ঘুমের ঘোরে হাউ মাউ করিয়া উঠিয়া এক বস্ত্রে বাহির হইয়া আসিয়া আম বাগানে গাছতলায় বসিয়াছে। ঘরের আগুনের দিকে চাহিয়া বনবিড়ালের মত ডাক ছাড়িতেছে। মজুরেরা গাইবলদ খুলিয়া দিয়া আগে হইতে পলাইয়াছিল। তাহারা চেষ্টা করিলে কতক জিনিস বাঁচাইতে পারিত, কিন্তু পরের জন্য কয়জন আগুনে প্রবেশ করে? বেলা ফুরাইয়া আসিয়াছে। বাঘসিংহের বাড়িতে শিশু হইতে বুড়া পর্যন্ত কাহারও দাঁতে দাঁতনও লাগে নাই: শিশু ও বউগুলি ঝিম মারিয়া গিয়াছে। বুড়া পুরোহিত কেলু রথ মহাশয় অনেক বুঝাইয়া সকলকে দাঁত মাজাইলেন। বাড়ি হইতে, গুড় চিড়া, বাটি বাটি আমানি সকলকে কিছু কিছু খাওয়াইয়া চাঙ্গা করিলেন। স্ত্রীলোকদের কেহ খাইল কেহ বা খাইল না, বাঘসিংহের ঘরের গৃহিনী ঢক ঢক করিয়া এক ঘটি জল খাইয়া পড়িয়া রহিলেন। ধানের গোলা বাদে আর আর ঘরের আগুন নিবিয়াছে, কোনও কোনও ঘর হইতে অল্প অল্প ধুঁয়া বাহির হইতেছে।

রাত্রি দুইপ্রহর, ভাইদের সহিত বাঘসিংহ এবং গাঁয়ের লোকেরা সকলে একটা গাছতলায় বসিয়া আছেন। বাঘসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আগুন কি করে লাগল?' সকলের প্রশ্ন আগুন কি করিয়া লাগিল? উত্তর দেয় কে? কেলু রথ বলিলেন, 'আগুন লাগাবে কে? বাঘের দুয়ারে কে আসবে? হিংগুলা ঠাকুরানীর কর্ম।' সকলে তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—ঠিক, এই কথাই ঠিক। গোবিন্দ রথ বলিলেন, 'না হে, তা নয়, বুড়িমঙ্গলার কোপ। দেখছেন না, মঙ্গরাজ সারা বৎসর ধরে পুজো লাগিয়েছেন। আমি কতবার বললাম পুজো পাঠান, শুনলেন না, এখন দেখলেন তো? আমি না বুঝেসুঝে কথা বলি না। ঠাকুরানী রুষ্ট না হলে খিড়কির খড়ের দড়ির গাদা থেকে আগুন কেমন করে এল?' মাণিক বলিল, 'সে সকল কথা যাক, নূতন বউয়ের পয় বড় মন্দ। তিনি এ বাড়িতে পা দেওয়া ইস্তক নানা অমঙ্গল পিছু লেগেছে।' শামার মা বলিল, 'কথাটা সত্য, খাঁটি সত্য, ভয়েই না বলতে পারছিলাম না। দেখলেন না চৈত্র মাসে কোথাও কিছু নেই গাইটাকে সাপে কামড়াল। সাপ কি এ গাঁয়ে ছিল না? গাইকে কামড়েছিল কোনও দিন? আমার তো বারো-গণ্ডা বয়স হল, বাঘসিংহের বাড়ির গাইকে সাপে কেটেছে একথা শুনি নি।' মকরা মজুর বলিল, 'নয় তো কি? দুই বছর আগে আমার হাতীর মত দুটো বলদ দুম দাম করে বসে পড়ল।' অর্জুনা মজুর বলিল, 'এই আম বাগানে আমাদের কত গরু চরছিল, এ বছর একটা দেখতে পাওয়াও স্বপ্ন।' মজুরনী, নাপিতনাপিতানী, সকলের অনুমান যুক্তি এবং প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা স্থির হইল বউ অপয়া হওয়াতেই আগুন লাগার কারণ। এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়া মাণিক পুনশ্চ বলিল, 'দেখছ না, বউয়ের মাসী যেমন পা দিয়েছে তিন দিন যায় নি, তিন পক্ষ যায় নি, অমঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে।' বাঘসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বউয়ের মাসী কে?' ডুলিতে চড়িয়া বউয়ের মাসীর আগমন, অশ্বারোহণপূর্বক ডালিযোড়ার ফতে সিংহের দেবদর্শনে যাত্রা ইত্যাদি যথা দৃষ্ট যথা শ্রুত সালঙ্কারে মাণিক বর্ণনা করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মাসী কয় ভার তত্ত্ব আনিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা ও তত্ত্বের বর্ণনা করিতে বিস্মৃত হইল না। সাবির মা জেলেনী বলিল, সে গোবিন্দপুরে কতবার চিড়া বিক্রয় করিতে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে বউয়ের মাসীর চেহারা ঠিক রামচন্দ্র মঙ্গরাজের বাড়ির চম্পার মত। শঙ্করা মজুর বলিল, যে লোকটা কাঠালের ভার বহিয়া আনিয়াছিল সে মঙ্গরাজের মজুর। বাঘসিংহ ও তাঁহার ভাইরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া বলিলেন, 'আমরা তো সোজা রাস্তা ধরেই কেন্দ্রা-

পাড়া থেকে আসছি, ডুলি কিম্বা ঘোড়া তো কই দেখলাম না?' কেন্দ্রা-পাড়ার রাস্তায় ও ডালিযোড়া ফতে সিংহের বাড়ি রাতারাতি লোক ছুটিল। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া যে সংবাদ দিল, তাহা হইতে জানা গেল সর্ব্বৈব মিথ্যা, মাসীর অস্তিত্বও কেহ স্বীকার করে না। এই ঘটনা লইয়া গ্রামে অনেকদিন ধরিয়া আলোচনা চলিল, আশপাশের গ্রামেও কথাটা তোলপাড় হইল। সকলে অনুমান করিল ইহা মা মঙ্গলার মায়া। আমরা বলি পিশাচীর কার্য হইতে পারে। ডালিযোড়ার ফতে সিংহ তত্ত্বতালাস করিতে আসিয়া মেয়েকে লইয়া গেলেন। লোকে বলে, বেচারী যেরূপ অন্নজল ত্যাগ করিয়া বসিয়াছিল, বাপ আসিয়া লইয়া না গেলে প্রাণ রাখা কঠিন হইত।

১৮ ॥ কর্ত্রীঠাকরুন

'সর্বে চলিবে কাল বলে, কথা রহিবে মহীতলে।'

শ্রাবণ মাস, রাধাষ্টমীর দিন। খুব ভোর, অল্প অল্প অন্ধকার আছে, লোকেরা বিছানা ছাড়ে নাই। অবশ্য অনেকের ঘুম ভাঙিয়াছে, কিন্তু খুব দরকার না থাকিলে বর্ষা ও শীতকালের ভোরবেলায় বিছানাটা যেন লোককে একটু আঁকড়াইয়া ধরে। মঙ্গরাজের বাড়ির দাসী মরুআ বাঁ হাতে ঘটি লইয়া ডান হাতে কবাট খুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইল। হঠাৎ দৃষ্টি তুলসীতলায় পড়িতে থমকিয়া দাঁড়াইল। সাদা মত ওটা কি? বাড়ির মাঝের আঙিনায় তুলসীমঞ্চ। কর্ত্রীঠাকরুনের নিজস্ব বলিতে ঐ তুলসীমঞ্চটুকু। তুলসীর পূজা তাঁহার জীবনের ব্রত। নিজ হাতে চারা আনিয়া লাগাইয়াছিলেন। সকাল থাকিতে উঠিয়া তুলসীমঞ্চের চারিপাশ ঝাঁট দেওয়া, গোবর জলের ছড়া দেওয়া, স্নান সারিয়া আসিয়া তুলসীর গোঁড়ায় জল দেওয়া, আতপ চাল চারটি ভোগ দেওয়া, সন্ধ্যা দেওয়া এই সকল কাজ করিতে করিতে বেলা ফুরাইয়া যায়। সন্ধ্যা দিয়া গলায় আঁচল দিয়া পুরা আধ ঘণ্টা প্রণাম করেন। চুপি চুপি কি নিবেদন করেন মা তুলসীই জানেন।

মরুআ আস্তে আস্তে তুলসীমঞ্চের কাছে গিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। অ্যাঁ—এ কি? 'মা ঠাকরুন—মা ঠাকরুন—মা ঠাকরুন—' উত্তর নাই। মরুআ ঘটিটি মাটিতে রাখিয়া গায়ে হাত দিয়া নাড়া দিল। রাত্রে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কাপড় চোপড় ভিজা, কাদায় লুটাইয়া পড়া দেহটা কাঠ হইয়া গিয়াছে, বরফের মত ঠাণ্ডা। মরুআ এক ভয়ানক চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিতে বসিল, 'আমার মা ঠাকরুন গো, আমার মা ঠাকরুন, ছেড়ে কোথায় গেলে, আমার মাঠাকরুন গো! পিঁপড়ের পেটের কথা কে জানবে—আমার মা ঠাকরুন গো। আমার জ্বর হলে কে পথ্যি রেঁধে খাওয়াবে—আমার মা ঠাকরুন গো।' মরুআর চীৎকার শুনিয়া বাড়ির সকলে ছুটিয়া আসিল, আঙিনা ভরিয়া গেল। সকলে কাঁদিতে বসিল, বউদের মাথায় কাপড় নাই, কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। সকলের চাইতে বেশী কাঁদিল চম্পা। সে খিড়কির দুয়ার হইতে সদর দুয়ার পর্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিল। সকলেই কাঁদিতেছে, কে কাহাকে থামায়? মুহূর্তের মধ্যে গাঁয়ের এ মুড়া হইতে ও মুড়া পর্যন্ত

বিদ্যুৎগতিতে খবর ছুটিয়া গেল। স্ত্রীলোকেরা বাসীপাট ফেলিয়া, পুরুষেরা আপন ধান্দা ছাড়িয়া কর্ত্রীঠাকরুনের গুণ গাহিতে বসিল। নিতান্ত অনাত্মীয়া মেয়েরাও কাঁদিয়া ফেলিল। কেহ বলিল—আজ মহা-ষ্টমী, পুন্যদিনে গাঁ হইতে লক্ষ্মী চলিয়া গেলেন। কেহ বলিল—মঙ্গরাজের বাড় বাড়ন্ত এই পর্যন্তই, আজ হইতে শ্রী ছাড়িল। গাঁয়ের মেয়েদের মধ্যে স্বামীসেবার কথা হইলে কর্ত্রীঠাকরুনের দৃষ্টান্ত দেখানো হইত। তাঁহার চরিত্র যেরূপ নির্মল, ধর্মেও সেইরূপ মতি। স্ত্রীলোকের সর্বস্ব ধন স্বামীর সোহাগ, বিধাতা তাঁহার কপাল হইতে মুছিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার দুঃখ ছিল না। তিনি মনে ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন পতিসেবা স্ত্রীলোকের ধর্ম, পতিসেবাতেই স্ত্রীলোকের সুখ। কেবল পতিসেবা নহে, মানুষের সেবাকেও তিনি মহাসুখকর জ্ঞান করিতেন। সেয়ানা হওয়া অবধি ছেলেরা কাছে ঘেঁষেনা। বউয়েরা যে অমান্য করিত তাহা নহে, কিন্তু মুরুব্বি বলিয়া মানিত না। শাশুড়ী পড়িয়া আছেন বলিয়া যে বউয়েরা তেল হাতটা পায়ে হাতে বুলাইয়া দিতেছে এটা কখনও দেখা যায় নাই। ইহা কিন্তু কর্ত্রীঠাকরুনের স্বকৃত দোষের ফল। গৃহিনী-পনা দেখাইবার, ছেলে বউ চাকর চাকরানীদের শাসনে রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তাহা তিনি ভালও বাসিতেন না। তাঁহার কাছে মুড়ি-মুড়কির এক দর ছিল। তাঁহাকে যে মানিল সে ভাল, যে না মানিল সেও ভাল। কেহ দশটা কথা বলিয়া গালি দিলে মুখ বুজিয়া বোবা হইয়া থাকিতেন। শালগ্রাম শিলার শোয়া বসার ন্যায় তাঁহার হাসিকান্নাও কেহ জানিতে পারিত না। কাহারও সঙ্গে ঝগড়া বা কাহারও সঙ্গে ভাব নাই। কাহারও কাছে বসিয়া দুইটা সুখদুঃখের কথা বলিতে কেহ দেখে নাই। কেবল সংসারে কাহারও অসুখ করিলে দিন নাই, রাত্রি নাই, জাগিয়া বসিয়া সেবা করেন। রোগে পড়িলে ঝি হউক বা বউ হউক সে না না বলিতে বলিতে পায়ে হাতে হাত বুলাইয়া দিবেন। বাহিরে হোক বা ঘরে হোক কেউ উপোসী থাকিলে তাহাকে না খাওয়াইয়া জলস্পর্শ করিতেন না। গাঁয়ের গরীব বৃদ্ধা বা অনাথ বিধবাদের সর্বদা খবর নিতেন। কাহারও ঘরে অন্ন নাই শুনিলে কর্তাবাবুকে লুকাইয়া, ছেলে বউদের লুকাইয়া এক কাঠা চাল, এক মুঠা কলাই, কয় চিমটি লবণ, একটু তেল, এক ফালি কুমড়া, কিছু ঢ্যাঁড়শ, ঝিঙা, যাহার যাহা প্রয়োজন পাঠাইয়া দিতেন। গাঁয়ের কাহারও ঘরে বউ ঝির ব্যথা উঠিলে দাসী পাঠাইয়া তদবির করিতেন। কিছু দেন বা না দেন তাঁহার কাছে গরীব দুঃখীদের বড় আশা ভরসা। দেনা শোধে অক্ষম অনেক খাতক, অনেক দরিদ্র প্রজা,

কর্ত্রীঠাকরুনের চেষ্টায় মঙ্গরাজের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া শুনা যায়। মঙ্গরাজ কাহারও উপরে জুলুম করিলে সে যদি বউ ঝি পাঠাইয়া কর্ত্রীঠাকরুনের কানে কথাটা পৌঁছাইতে পারিল তা হইলে আর চিন্তা নাই। সেজন্য মঙ্গরাজের কাছে অনেক গালি ও গঞ্জনা সহিতে হয়। চম্পা ঠাট্টা তামাশা করিয়া কত কি বলে, কিন্তু কর্ত্রী-ঠাকরুন তখন কালা। কাহারও উপকার করিতে পারিলে তাঁহার যেন সাত রাজার ধন লাভ হয়। শিবু পণ্ডিত সাধুভাষায় বলেন, কর্ত্রীঠাকরুন দয়া স্নেহ ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় গুণাবলীর মূর্তিমতী দেবী।

কর্ত্রীঠাকরুনের কিন্তু একটি আশ্চর্য স্বভাব ছিল, সেটি দোষ কি গুণ আমরা স্থির করিতে পারিতেছি না, আপনারাই বলিবেন। পাঁচটা কথা জুড়িয়া রঙ্গ-রস করিয়া কহিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। কথাগুলি আবার এত ধীর যে সদর দুয়ারের লোক কেহ কখনও তাঁহার গলা শোনে নাই। কিন্তু কর্তাবাবু বাড়ির ভিতরে কোনও দাসী বা চাকরের উপর রাগিয়া গালি দিলে বা মারিতে গেলে কর্ত্রীঠাকরুন কিছু না বুঝিয়া সুঝিয়া মাঝে গিয়া পড়িতেন, এবং বিবিধ যুক্তি প্রয়োগপূর্বক তাহার নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন। তখন তাঁহার সত্য মিথ্যা জ্ঞান থাকিত না। সুতরাং কর্তাবাবুর রাগটা তাঁহারই উপর দিয়া যাইত। পরের জন্য, বিশেষতঃ দোষীকে রক্ষা করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলা এবং অন্যের অপরাধের জন্য নিজে লাঞ্ছনা ভোগ করা অবশ্য বুদ্ধিমত্তার কার্য নহে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহার স্বভাব বদলায় নাই। স্বভাবো নৈব মণ্ডতে। দোষী হউক বা নির্দোষী হউক কাহারও কোনও দুঃখ দেখিলে তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন।

আর-একটা কথা, বাড়িতে দুইটা দাসীর মধ্যে বা বউয়ে বউয়ে ঝগড়া হইলে তাঁহাকে প্রায়ই দুর্বলের পক্ষ অবলম্বন করিতে দেখা যাইত; এটা অবশ্য পক্ষপাতিত্বের লক্ষণ। বুঝিয়া সমঝিয়া পক্ষ লইতে হয়, তাঁহার মধ্যে এই গুণের নিতান্ত অভাব ছিল।

কর্ত্রীঠাকরুনের একটি মহৎ দোষ ছিল—অবশ্যই মহৎ দোষ বলিতে হইবে; কর্তাবাবু এজন্য চিরকাল বিরক্ত—তাঁহার ঘরকন্নার বুদ্ধি এক তিলও ছিল না। টাকা পয়সা যে কি মহামূল্য পদার্থ তিনি তাহা বুঝিতেন না। তিনি চান না, সুতরাং কিছু পান না। যদি দৈবাৎ দুই আনা চারি আনা পয়সা, টাকাটা সিকেটা হাতে পড়িয়া যায়, ধান সিদ্ধের হাঁড়ি অথবা ভুসির হাঁড়ি চাপা দিয়া রাখিতেন, নয় তো ঘরের চালে গুঁজিয়া দিতেন। গাঁয়ের কাহারও মেয়ে শ্বশুর বাড়ি যাইবার সময় একখানা

শাড়ি কিংবা থুপানি এক জোড়া কিংবা মুড়ি মুড়কি দুই কাঠা মুক্ত হস্তে কিনিয়া দিতেন, আবার কাহারও ঘরে খাইবার কিছু না থাকিলে তাহারও ভাগ্যেও এরূপ জোটে। এরূপ দিতেন বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু কেহ কখনও দেখে নাই। যাহা হউক কত্রীঠাকরুনের দোষ থাক বা গুণ থাক ঘর হইতে বাহির পর্যন্ত সকলে হায় হায় করিতেছে। কেবল কাঁদিতেছেন না একজন। মুকুন্দা মজুর ফোকলা মুখটা হাঁ করিয়া চোখ বুজিয়া মাংসহীন লিকলিকে পা দুইটা ছড়াইয়া দিয়া বেড়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। মুকুন্দার তিন কুলে কেহ আছে বলিয়া জানা নাই। তাহার বয়স, জাতি, কুল গুণ গ্রামের কথা কি শুনিবেন? চাকর মজুরের কথা কেই বা শুনিতে চাহে? সে নিজে বলে, মাঠাকরুনের জন্মের সময় সে দাই ডাকিতে গিয়াছিল, তাহার কোলে মাঠাকরুন এতটুকু বয়স হইতে বাড়িয়াছেন, বাপের বাড়ি হইতে সে সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। হাবার কথা হাবার মা বুঝে, কেবল মুকুন্দা কত্রীঠাকরুনের মনের কথা বুঝিত। কোনও বিষয়ে কত্রীঠাকরুন দুঃখ করিলে মুকুন্দা আসিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, কত্রীঠাকরুন তাহার দিকে চাহিয়া মাথা নিচু করিতেন। সেই চাহনি অর্থাৎ নীরব বক্তৃতায় সব কথার শেষ হয়। কত্রীঠাকরুন সান্ত্বনা পাইয়া চুপ করিতেন। কত্রীঠাকরুন কিছুমাত্র মনোদুঃখ পাইলে যাহার চোখ হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িত, আজ তিনি মরিয়া পড়িয়া আছেন সে কাঁদিতেছে না। যাহার জগতে সমস্ত সুখ—সমস্ত শান্তি—সমস্ত আশা—সমস্ত ভরসা—সমস্ত সান্ত্বনা—সমস্ত স্নেহ এক সঙ্গে শেষ হইয়া যায় সে কাঁদে না। কেবল সে এক এক বার ফোঁস ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে। বোধ হয় সেইজন্য তাহার শুষ্ক হৃদয় একেবারে ফাটিয়া যাইতেছে না।

মঙ্গরাজ শিয়রে বসিয়া একদৃষ্টে কত্রীঠাকরুনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। নিশ্চল স্তব্ধ দুই চোখ হইতে অশ্রু বহিয়া যাইতেছে। মঙ্গরাজের চোখে কেহ কখনও জল দেখে নাই, আজ নূতন দেখা গেল। লোকে বলে, স্নেহ মায়া মমতা চক্ষুলজ্জা ধর্ম-কর্ম মঙ্গরাজের মনকে স্পর্শ করে নাই। তিনি ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন, টাকা এব মনুষ্যানাং চতুর্বর্গফলপ্রদা। দিবা রাত্র তাঁহার টাকা ছিল ধ্যান, টাকা ছিল জ্ঞান। তাঁহাকে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে অনেক সময় দেখা গিয়াছে। কিন্তু সেসময়ে এক প্রকার জ্যোতি তাঁহার চোখ হইতে বাহির হয়। সমুদ্রগর্ভ-জাত উত্তাল তরঙ্গমালা বেলাভূমিতে পড়িয়া লীন হওয়ার মত হৃদয়জাত

নানা আশা নানা চিন্তার তরঙ্গ আসিয়া ভ্রূলতার উপরিভাগে রেখাকার ধরিয়া লীন হইতে থাকে। আজ ভাবনা কিন্তু অন্যরূপ। নেত্র অর্ধ-নিমীলিত, স্পন্দনশূন্য, অশ্রুসিক্ত। মঙ্গরাজ কি কর্ত্রীঠাকরুনের জন্য কাঁদিতেছেন? প্রিয় বস্তুর বিয়োগ মনুষ্যের পক্ষে অসহ্য। মঙ্গরাজ কি পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের স্বর্গীয় মাধুরী অনুভব করিতেন? কই, কর্ত্রী-ঠাকরুনকে মিষ্ট করিয়া দুইটা কথা বলিতেও তো তাঁহাকে কেহ শুনে নাই? তবে আজ এত ব্যাকুল কিসের জন্য? যাহা হউক, কর্ত্রীঠাকরুনের বিচ্ছেদ যন্ত্রণাটা যে তিনি অনুভব করিতেছেন সহজ বিশ্বাসে আমরা ইহা অনুভব করিতেছি। যাহাকে আটটি পূর্ণ কুম্ভবেষ্টিত বেদীর উপরে বসিয়া অর্ধাঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছ সে ভাল হউক বা মন্দ হউক তাহার উপর একটা মায়া পড়িয়া যায়। এই নৈসর্গিক মানবধর্ম অতিক্রম করা সহজ নয়। যে স্ত্রী ধর্ম কার্যে সহধর্মিনী, প্রাণাধিক সন্তান সন্ততির জননী, যে স্ত্রী সুখ দুঃখের একমাত্র সমভাগিনী, যে স্ত্রী রোগে শুশ্রূষা-কারিণী, বিপদে মন্ত্রী, শরীর রক্ষায় ধাত্রী, তুমি যদি নিতান্ত পাষণ্ড না হও, তাহার গুণগরিমা অনুভব করিবার শক্তির অভাব যদি নিতান্তই তোমার না থাকে—বাঁচিয়া থাকিতে তাহাকে ভাল বাস বা না বাস, তাহার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। আর সাধবী, সচ্চরিত্রা, পতি-পরায়ণা, ধার্মিকা স্ত্রীর গুণগরিমা যে একবার মাত্রও হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে, তাহার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা যে কিরূপ অসহ্য তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা সৃষ্টি হয় নাই। তাহা পত্নীবিয়োগবিধুর ব্যক্তি কেবল হৃদয়ে অনুভব করে। গোখুরা সাপ যাহাকে দংশন করিয়াছে, সেই বিষের যন্ত্রণা জানে, কথায় বুঝাইবার বস্তু নহে। সেই জানে শোণিতবাহিনী শিরা সকল ছিন্নভিন্ন হইয়া তাহার হৃৎপিন্ড শুষ্ক হইয়া পড়িয়া আছে, সেই অনুভব করে জগতের সমস্ত সুন্দর পদার্থের সৌন্দর্য, সমস্ত মাধুর্যের মধুরিমা, সমস্ত পুষ্পের সুগন্ধ, সমস্ত সংগীতের তান লহরী, সমস্ত পবিত্রতা চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সে আপনাকে মৃত লোকের মধ্যে জীবিত, জীবিতের মধ্যে মৃত বলিয়া জ্ঞান করে।

মঙ্গরাজের জীবনক্ষেত্রে দুইটা নদী প্রবাহিত হইত। একটি উত্তাল তরঙ্গময়ী সর্পকুম্ভীরসঙ্কুলা কুলপ্লাবিনী চর্মণ্বতী, আর একটি অন্তঃ-শ্রোতা পূতসলিলা কূলপাবনী ফল্গু। হয়ত মঙ্গরাজ বুঝিয়াছেন ফল্গু চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল। মদ্যপের সম্মুখে এক বাটি জল আর-এক বাটি সুরা রাখিলে সে সুরাপাত্রটিকেই বেশী আদর করে

এবং যত্ন করিয়া রাখে; কিন্তু জলের বাটিটির নিতান্ত অভাব হইলে সে তখন বুঝিতে পারে সুরা উন্মাদনাকারিনী সত্য, কিন্তু জল তাহার জীবন।

মঙ্গরাজের অবস্থা দেখিয়া আমরা অনুমান করিতেছি তাহার মনে দুঃখ ও অনুতাপ উভয় উপস্থিত হইয়াছে। দুঃখে মানুষ কাঁদে, অনুতাপে কাঁদে না। দুঃখ হৃদয়ের জ্বলন্ত অঙ্গার, অনুতাপ তুষানল। নিজের দুষ্কৃতি নিজের অযত্নের সহিত কর্ত্রীঠাকরুনের মৃত্যুর নিকট সম্বন্ধ আছে এইরূপ অনুমান করিয়া তিনি অনুতাপ করিতেছেন কি? তাঁহার দ্বারা সংখ্যাতীত দুষ্কৃত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কই, কখনও তো তাঁহাকে অনুতাপ করিতে কেহ দেখে নাই? কে বলিতে পারে? ক্ষণপরিবর্তনশীল মনুষ্যস্বভাব কে জানে? বিশ্ববিধাতা সমান উপাদানে জগতের সমস্ত নরনারীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। রক্ত মাংস অস্থি মল মূত্রে যেরূপ শরীর গঠিত, সেইরূপ দয়া মায়া স্নেহ মমতা হিংসা দ্বেষ নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি বৃত্তিতে মন গঠিত। সেই সকল বৃত্তি উপযুক্তরূপে সমানভাবে কার্যকরী হইলে মানুষ মানুষ হইয়া থাকে। কিন্তু যদি একটি উপাদান প্রবল হইয়া সীমা লঙ্ঘনপূর্বক অন্য বৃত্তিগুলির উপর আধিপত্য বিস্তার করে তবে সে মানুষের মনুষ্যত্ব লুপ্ত হইয়া যায়, তখন হয় সে দেবতায় নয় তো রাক্ষসে পরিণত হয়। অর্থাৎ মানুষের মন স্বর্গীয় ও নারকীয় দুই প্রকার বৃত্তিতে গঠিত। স্বর্গীয় বৃত্তি মানুষকে দেবতায় পরিণত করে ও নারকীয় বৃত্তি রাক্ষস করিয়া ফেলে। যদি তুমি শুন একজন দয়াপরবশ হইয়া অন্যের জীবন রক্ষা করিতে গিয়া আপন জীবন বিসর্জন দিয়াছে, তখন তাহাকে কি দেবতা ভাবিবে না? যখন শুন একজন কয় খণ্ড সোনা রূপার অলঙ্কারের জন্য একটি শিশুহত্যা করিয়াছে, মিলাইয়া দেখ পুরাণবর্ণিত রাক্ষসের সহিত তাহার মিল হইতেছে কি না? তবে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল না হইলেও সচরাচর দেখা যায় না। মানুষ চিরকাল মানুষ এবং মানুষের মনের মূল উপাদান সমান হইলেও বাহ্য প্রকৃতি সামঞ্জস্যহীন। কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনের চেহারার সহিত অন্য কারও চেহারার মিল নাই, মানস প্রকৃতিও সেইরূপ। কাহারও কোনও চিত্তবৃত্তি বলবান, কাহারও দুর্বল, কাহারও বা চিরনিদ্রিত। সময় বিশেষে ঘটনাচক্রের পরিবর্তনে নিদ্রিত বৃত্তি সকল জাগ্রত হইয়া উঠিতে দেখা যায়। মদ্যপ দুরাচার জগাই-মাধাই পরমবৈষ্ণব হইবে কে জানিত? আর খ্রীষ্টবিদ্বেষী অত্যাচারী পল আজ পূজনীয় মহর্ষিপদবাচ্য। গাধিনন্দন রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের সহস্র সহস্র যুগব্যাপী তপস্যা ও ততোধিক জ্বলন্ত ব্রহ্মনিষ্ঠা মেনকার নিমেষমাত্র অপাঙ্গ

দৃষ্টিতে টলিয়া গেল। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখুন, এরূপ হঠাৎ পরিবর্তনের মূল কারণ ঘটনা এবং সংসর্গ। ভগবান্ শঙ্করাচার্যের মহাবাক্য সকলের স্মরণ রাখা উচিত—

ক্ষণমিহ সজ্জনসংগতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।

সনাতন ব্রাহ্মধর্মের উপদেশ—তুমি পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে ঘৃণা করিও না।

মানুষ যে বৃত্তির বশবর্তী হইয়া অনুতাপ করে, একথা কে বলিতে পারে মঙ্গরাজের আজ সেই বৃত্তি জাগিয়া উঠে নাই? আমরা অন্তর্যামী নই, মঙ্গরাজের মনের ভাব কি করিয়া জানিব? জানিলেও দুঃখ এবং অনুতাপ যুগপৎ কিরূপে তাঁহার মনকে বশীভূত করিয়া কণ্ঠরোধ ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য করিয়া ফেলিতেছে তাহা বর্ণনা করিয়া আপনাদিগকে বুঝাইবার শক্তি নাই। বোবা যেরূপ কথা বলিতে না পারিয়া হাত পা নাড়িয়া আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে আমরাও সেইরূপ কতকগুলি আবোল তাবোল বকিয়া গেলাম।

হে মাননীয় পাঠক, ক্ষমা করুন, আজ এই থাক। দেবদুন্দুভি বাজিতেছে, সধবার শবযাত্রার নাকাড়া-ধ্বনি। সদ্যমৃতার স্বামী আগে আগে খই আর কড়ি ছড়াইতে ছড়াইতে যাইতেছে, সেই কড়ি কুড়াইয়া লইয়া লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে রাখিবার জন্য গ্রামের সুলক্ষণা এয়োস্ত্রীগণ পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন—এই থাক্।

হরি বল রে মন।

১৯ ।। পুলিশ তদন্ত

প্রতিদিন গোবিন্দপুরে যেমন করিয়া রাত্রি পোহায় আজও ঠিক তেমনি করিয়াই রাত্রি পোহাইয়াছে, কিন্তু সূর্যের দেখা নাই। ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। "ভোরের বৃষ্টি বৃষ্টি নয়, ভোরের অতিথি অতিথি নয়।" আকাশটা একটু পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে, ক্ষেতে বাছাইএর কাজ ফুরাইয়াছে, কেহ আর ক্ষেত-খামারের দিকে যায় না। কেহ দাওয়ায় বসিয়া বাটনা বাটিতেছে, কেহ গোয়াল সাফ করিতেছে, কেহ কেহ মাথালি মাথায়, দাঁড় ও কাস্তে হাতে, মোটা ও বড় বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে বাঁক কাঁধে ফেলিয়া ঘাস কাটিতে বাহির হইয়াছে। কেহ ঘরের চালে উঠিয়া কুমড়ার ডগা সামলাইতেছে। ঘরে নুন নাই শুনিয়া হরি পুহান বিবিধ যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক স্বীয় ভার্যার অপরিমিত ব্যয়শীলতা প্রমাণ করিতেছে। মেয়েরা বাসীপাট সারিয়া পুকুর পাড়ে বাহির হইয়াছে। তাঁতীপাড়া তাঁতের খটাখট শব্দে মুখরিত হইতেছে, তাঁতীনীরা দাওয়ায় বসিয়া খড় খড় করিয়া লাটাই ঘুরাইতেছে। বেলা আন্দাজ তিন ঘড়ির দুই এক দণ্ড বেশী, শাম সাহুদের ক্ষেত-মজুর গোপাল সামল মাথালি মাথায় কোদাল হাতে নিচু হইয়া ক্ষেতের আল বাঁধিতেছিল। রাস্তার ধারের ক্ষেত, জমিদার বাড়ির মজুর ঘুষুরিআ তাড়াতাড়ি গোবরা জেনার ঘরের দিকে চলিয়াছিল, গোপালিআর উপর নজর পড়িয়া যাওয়ায় হাত তুলিয়া ইসারা করিয়া ডাকিল। বলিল, 'আমি বড় এক কঠিন কাজে যাচ্ছি, কথাটা বড়ই গোপনীয় তোকে বিশ্বাস করি তাই তোকে বলছি।' তাহার কানে চুপি চুপি কি যেন বলিল। 'দেখিস্, খবরদার! এ কথা যেন আর কারও কানে না যায়, কর্তাবাবুর মানা আছে।' ঘুষুরিআ যাইতে যাইতে পথে মকর জেনা পাণ-অকে দেখিল, তাহার কানে কানেও চুপি চুপি কয়েকটি কথা বলিয়া তাহা গোপন রাখিতে উপদেশ দিয়া চলিয়া গেল। তারপর দনেই সাহু, বিনোদিআ, নটবরিআ, ভীমার মা ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাদেরও সেইরূপ চুপি চুপি কি যেন বলিয়া তাহা গোপন রাখিতে উপদেশ দিল। গোপালিআ কাজ করিবে কি, সাহুদের বাড়ী ছুটিল। হরি সাহু বলিল শাম সাহুকে, হটিআ বলিল নটিআকে, জেমার মা বলিল শমর মাকে, শ্রীমতী বলিল বাড়ির বউ ঝিকে, গোটা গ্রামের লোক বলাবলি করিল—সকলেই চুপি

চুপি বলিল ও গোপন রাখিতে উপদেশ দিল। কেহ বলিল, এখনই জমাদার আসিবে। অন্য কেহ তাহার প্রতিবাদ করিয়া কহিল, না, না, খুনী মামলা, দারোগা নিজে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিবেন। কিন্তু ওয়াকিব লোকে বলিল, এ কি তোমার আমার কথা? কটক হইতে কোম্পানী স্বয়ং পলটন লইয়া আসিবেন, গাঁয়ের লোকে যে ধর-পাকড় হইবে ইহা নিঃসন্দেহ, সর্ববাদিসম্মত। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাঁ নিস্তব্ধ হইয়া গেল। বউ-ঝিরা জলে এক একটা ডুব দিয়াই উঠিয়া ঘর পানে চলিল, কাপড় নিংড়াইবারও সময় নাই, ভিজা কাপড় লটর পটর করিতে করিতে চলিয়াছে, পা বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। তাড়াতাড়িতে কলসী পুরে নাই, আধ কলসী জল। বড় বড় দেশহিতৈষীরা সভায় বক্তৃতা করার ন্যায় গাঁক গাঁক করিয়া বেজায় চিৎকার করিতেছে। বেত্রহস্ত গুরুমহাশয় সহসা অন্তর্ধান হওয়াতে পড়ুয়ারা পথে গিয়া ভারী গোলমাল ও দৌড় ঝাঁপ সুরু করিয়াছে। খুনী আসামীকে পুলিস যেমন করিয়া বাঁধিয়া লইয়া যায় সর্দার পোড়ো তেমনি করিয়া একটি ছোট ছেলেকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, সর্বাপেক্ষা এখন সেই ছেলেটিই বেশী দৌড়াইতেছে।

ঘুষুরিআ ফিরিয়া আসিয়া কর্তাবাবুকে খবর দিল, গোবরা জেনা ঘরে নাই, সে কাল রাতে ঘরেই ফেরে নাই। কর্তাবাবু প্রথমে ক্ষেত-মজুর পাঠাইলেন, পরে স্বয়ং তাঁতীপাড়ায় ঘরে ঘরে গেলেন, একজনেরও দেখা পাইলেন না। আর যার ঘরেই যান কবাট বন্ধ, ঘরে কেউ নাই। মঙ্গরাজ নিতান্ত চিন্তিত হইয়া ঘর বার করিতে লাগিলেন, কাহারও দেখা না পাইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ঘুষুরিআ মজুর একটা লাঠি লইয়া খিড়কির দিকে কুকুর তাড়াইতেছে, দুইটা শিয়াল কেয়া বনের ভিতর ঢুকিয়া জ্বল জ্বল করিয়া ঘরের চালের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বেলা দুপুর গড়াইয়া গেল। গোবিন্দপুর গ্রামের পূর্বপ্রান্তে এক টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া এক বিশালমূর্তি সওয়ার দেখা দিলেন। সওয়ারের বিপুলদাড়ি তাঁর বক্ষোদেশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, গায়ে ছয় কলিওয়ালা ঢিলা হাতা চাপকান, মাথায় জামদানির হেলানো টুপি, পরনে ঢিলা পায়জামা। ঘোড়া টুক টুক করিয়া মিঠা কদমে চলিয়াছে। আগে পিছে পাঁচজন লাঠিস্কন্ধ চৌকিদার হেলিয়া দুলিয়া দৌড়িতেছে। সকলের আগে গোবরা জেনা লাঠি কাঁধে ছুটিয়াছে। মঙ্গরাজের দেউড়ির সামনে গোবরা পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘোড়-সওয়ার শুধাইলেন, "এই বাড়ি?" গোবরা হাতজোড় করিয়া কহিল, "খোদাবন্দ।" সওয়ার ঘোড়া হইতে

নামিয়া "বিসমিল্লা" বলিয়া একটা হাঁপ ছাড়িলেন।

ঘণ্টা খানিক পরে গ্রাম্যপথে আর একটি ঘোড়সওয়ারের মূর্তি দেখা গেল। এটিও টাট্টু ঘোড়া, দানা বিহনে কেবল ঘাস পাতা খাইয়া বাঁচিয়া আছে বলিয়া মনে হয়, বয়সে প্রবীন—সাক্ষ্য দিবার জন্য পাঁজরার হাড়গুলি বাহির হইয়া আছে, পিছনের পা দুইটা ঘষা লাগিয়া ক্রমে লোমশূন্য ও ঘা ঘা হইয়া গিয়াছে, মুখ বসিয়া গিয়া চোখ দুইটা ঠিকরাইয়া আসিয়াছে, পিঠে লাল বনাতের পালান। সওয়ারের দেহটি কিন্তু বিশাল, পরিচ্ছদও বড়লোকের ন্যায়—মাণিআবন্দের* চারফুলি ধুতি পরনে, গায়ে ডোর-লাগানো জামা, মাথায় মাঝবরাবর সেলাই করা ছয়ফুলি রেশমী চাদর বাঁধা। ঘোড়ার পিছনে এক চৌকিদার বাঁশের লাঠি কাঁধে ফেলিয়া ডান হাতে কঞ্চির ছিপটি লইয়া মধ্যে মধ্যে ঘোড়াকে পিটিতেছে ও টাকরার আওয়াজ করিতেছে। এক পাণ-অ ছোকরা-সহিস একগাছি শনের দড়িতে ফাঁস লাগাইয়া সম্মুখ হইতে টানিতেছে। ঘোড়াটা গলা লম্বা করিয়া বড় কষ্টে আস্তে আস্তে টলিয়া টলিয়া চলিতেছে। এই সওয়ারও মঙ্গরাজের বাড়ির সামনে নামিলেন। একজনের কাঁধে দুই হাতের ভর দিয়া নামিতে গিয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া লোকটির গালে ঠাস্ করিয়া একটা চড় কষাইয়া দিলেন—অর্থাৎ সকলে জানুক তার পতনের কারণ ওই লোকটির অসাবধানতা, তা না হইলে এরূপ পাকা ঘোড়-সওয়ারের পড়িয়া যাওয়ার কথা নয়। সহিস ফাঁসের দড়ি ধরিয়া থাকা সত্ত্বেও সওয়ার নামিয়া যাওয়া মাত্র ঘোড়াটা জগন্নাথের রথের সামনে ভক্তরা যেমন করিয়া ধুলায় গড়াগড়ি দেয় তেমনি তিন চার বার গড়াগড়ি দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘোড়সওয়ারও ইতিমধ্যে দাঁত খিঁচাইয়া তাঁহার দেহের স্থান অস্থানের দাদগুলি চুলকাইয়া নিলেন।

শেখইনায়েৎ হোসেন কটক জেলার একজন পয়লানম্বরের পুলিস দারোগা, ফারসী এলেমে বড় মজবুত। ওড়িয়া নালায়েক এলেম, সেই জন্য তিনি ওড়িয়াতে লেখাপড়া করেন না, সরকারী কাগজপত্রে ফারসীতে দস্তখত করেন। অত্যন্ত লায়েক হওয়ার দরুণ বার বৎসর এক নাগাড়ে কেন্দ্রাপাড়া থানায় রহিয়া গিয়াছেন, কেবল গত বৎসর সদর কাছারির সেরেস্তাদার ও পেশকারের ফাই ফরমাশের সামগ্রী পেঁছাইতে বিলম্ব ঘটায় একবার বদলির হাঙ্গামা উঠিয়াছে শুনা গিয়াছিল। মুনশী চক্রাধর দাসও পুলিসের একজন বহুদর্শী আমলা। ইঁহার রিপোর্ট পড়িয়া ম্যাজিস্টর

*মাণিআবন্ধ॥ রেশমপাড় ধুতি ও শাড়ির জন্য প্রসিদ্ধ ওড়িশার বড়ম্বা অঞ্চলস্থ স্থানবিশেষ।

সাহেব নাকি ভারী খুশী—এইরূপ চৌকিদারদের কাছে সদাই শোনা যায়।

মঙ্গরাজের কাছারির হাতায় পুলিসের কাছারি বসিয়াছে। খোদ দারোগা ইনায়েৎ হোসেন একখানি শতরঞ্চিতে দাড়ির বাহার দিয়া বসিয়া আছেন। সামনে ডান দিকে মুনশী চক্রধর দাস হেঁসর* উপরে বিছানো ঘোড়ার-পালনের উপর বসিয়া আছেন। হাত কুড়ি দূরে বরকন্দাজ গোলাম কাদের ও হরিসিংহ এবং পাঁচজন চৌকিদার দাঁড়াইয়া আছে। রামচন্দ্র মঙ্গরাজ গ্রেফতার হইয়া তাহাদের নজরবন্দীতে মাথা নিচু করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। মঙ্গরাজের বাড়ির চারিদিকে যেন হাট বসিয়া গিয়াছে। বাহিরের মানুষ ভিতরে যাওয়ার বা ভিতরের মানুষ বাহিরে আসিবার হুকুম নাই। প্রথমে স্ত্রীলোকদের এক পাশে সরাইয়া দিয়া খানাতল্লাস আরম্ভ হইল। বাড়ির প্রত্যেক সিন্দুক, বাক্স ও পেটরা তল্লাস করা হইল, ধানের গোলায় লোহার সিক ঢুকাইয়া দেখা হইল, ভাতের হাঁড়ি তদারক করা হইল, দুই চার জায়গা খুঁড়িয়া দেখা হইল, ঘরের চালের দুই চার জায়গায় খড় টানিয়া ফেলা হইল, কোনও সন্দেহ জনক পদার্থের দেখা পাওয়া গেল না। কেবল মঙ্গরাজের শুইবার ঘর হইতে তিন চার হাত লম্বা এবং বুড়া আঙ্গুল ও মাঝের আঙ্গুলে বেড়িয়া ধরা যায় এমনি মোটা একখানি বাঁশের লাঠি বাহির হইল। খিড়কির পিছনে ছাঁচতলায় একটি স্ত্রীলোকের লাস একখানা পুরানো হেঁস-অ* দিয়া ঢাকা অবস্থায় পাওয়া গেল, উহা সদরের দিকে আনা হইল। সেই লাস তাঁতিনী শারি-আর বলিয়া গোবরা জেনা সনাক্ত করিল। দারোগা দাড়িতে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "কেওঁ রামচন্দর মঙ্গরাজ! অব্ ক্যা মতলব হ্যায়—রতনপুর ডোম লোকংকা মামলা ইয়াদ হ্যায় কি নেহিঁ?" মুনশী বলিলেন, "এক মাঘে শীত গেল বলিয়া মঙ্গরাজ মহাশয় ভাবিয়াছিলেন বুঝি?" আমরা গোপনে সন্ধান লইয়া জানিলাম, রতনপুরের ডোমদিগকে জেলে দেওয়ার জন্য মঙ্গরাজ মহাশয় দারোগাকে এক হাজার টাকা ঘুস দিবেন বলিয়া-ছিলেন কিন্তু শেষে ফাঁকি দিয়াছিলেন বলিয়া দারোগা সেই কথাটা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

মামলার তদন্ত আরম্ভ হইল। মুনশী চক্রধর তাঁহার বিশাল দপ্তর খুলিয়া সেরেস্তা মেলিয়া বসিলেন। গলায় দড়ি বাঁধা মুখে সোলার ছিপি দেওয়া চীনামাটির দোয়াত সামনে রাখা হইল। প্রথমে একটা শরের কলম

* হেঁস (উচ্চারণ অ-কারান্ত)—ওড়িশায় শয্যার্থ ব্যবহৃত বেনা ইত্যাদি তৃণনির্মিত পুরু পাটি।

শিশর্নকাঠের বাঁটওয়ালা ছর্নরিতে কাটিয়া একখানা ছোট কাগজে পরীক্ষা করিলেনঃ "শ্রীগর্নরর্নদেব উন্ধার করিবেন" "শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর চরণে শরণ" "শ্রীবলদেবজীউর চরণে শরণ" "শ্রীলিঙ্গরাজ মহাপ্রভুর চরণে শরণ" "শ্রীগ্রামদেবতার চরণে শরণ" ইত্যাদি দেবদেবীর নাম লিখিয়া কাছারির কাজে হাত দিলেন।

সরকার কোম্পানী বাহাদর্নর বাদী। রামচন্দ্র মঙ্গরাজ। সা। গোবিন্দপর্নর। জে। কটক। প্রতিবাদী।

শারিআ নামক তাঁতিনীকে হত্যা করিয়া তাহার ঘর হইতে নেঁত নামক গাই অপহরণ এবং অন্যান্য মাল লর্নঠতরাজ করিয়া আনিবার মোকন্দমা।

বাড়ি বাড়ি তল্লাস হইল। বরকন্দাজ চৌকিদারেরা সারা গ্রাম ঘর্নরিয়া আসিয়া খবর দিল, গাঁয়ে পর্নরর্নষ একজনও নাই, কবাটের ফাঁক দিয়া স্ত্রীলোকেরা যাহা জবাব দিয়াছে তাহাতে জানা যায় আট আনা লোকেই কুটম্ব গৃহে গিয়াছে, চারি আনা গরর্ন খর্নজিতে, দর্নই আনা জগন্নাথ দর্শনে, দর্নই আনা রোগ শয্যায়। কেবল ভিন্ন গ্রামবাসী দর্নইজন সাক্ষী আপন কর্তব্য বর্নঝিয়া নিজেই আসিয়া হাজির হইল। গ্রামের লোক হাজির না হওয়ায় দারোগা খাপ্পা হইয়া বরকন্দাজদিগকে উল্লর্নক, গাধা, বেঅকুফ, নালায়েক ইত্যাদি ইত্যাদি সম্বোধন করায় এইবারে সমস্ত গাঁয়ে হৈ রৈ পড়িয়া গেল। দমাদ্দম মার আর কপাট ঠ্যাঙগানো। সন্নিপাত রোগী কাঁথা মর্নড়ি দিয়া পড়িয়া থাকিয়া যমকে ফাঁকি দিয়া দর্নইদিন রহিয়া যাইতেও পারে কিন্তু পর্নলিসকে ফাঁকি দিবে কে? পর্নরর্নষেরা সর্নড় সর্নড় করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। দর্নই দিন ধরিয়া বত্রিশজন সাক্ষীর জবানবন্ধি নেওয়া হইল। প্রথম দিন দর্নইজন চৌকিদারের হেপাজতে লাস ময়নার জন্য কটকে চালান দেওয়া হইল। মর্ননশী সাহেব জেলখানার কয়েদীদিগের হাতে তৈয়ারী আড়াই দিস্তা হলদেটে রঙের কাগজে সকলের জবানবন্দি কলমবন্দী করিয়া ফেলিলেন। আপনাদের অবগতির জন্য তাহা হইতে কয়েক জন সাক্ষীর জবানবন্দি এখানে প্রকাশ করিলামঃ

১ নম্বর সাক্ষী, তরফ সরকার কোম্পানী বাহাদর্নর, আমার নাম গোবরা জেনা, বাপের নাম গর্নহিয়া জেনা মৃত, জাতিতে পাণ-অ, বয়স ৪৫ বৎসর, পেশা গ্রামের চৌকিদারি। সাকিন গোবিন্দপর্নর, পরগণা বালর্নবিশি। জেলা কটক।

আমি মৌজা-মজকুর চৌকিদার, সারারাত গাঁয়ে খাড়া পাহারা দিই। গত রাত্রে পাহারা দেবার সময় আন্দাজ মাঝরাতে শারিআ তাঁতিনী "মেরে

ফেললে, মেরে ফেললে” বলে মঙ্গরাজ মহাশয়ের খিড়কির দিক হতে চীৎকার করে ওঠে আমি শুনেছি। তাকে কেউ বাঁশের লাঠি দিয়ে মারছিল বলে মনে হল।

সওয়ালের জবাবে বলিল—না, আমি সে সময়ে মঙ্গরাজ মশায়কে দেখি নি। পুনর্বার বলিল—হাঁ হাঁ, তাঁর গলা পেয়েছিলাম। এই গাই শারি-আর, এর নাম নেত-অ। আজ একমাস হল মঙ্গরাজ মশায়ের আঙিনায় বাঁধা আছে দেখেছি, কি করে এখানে এল জানি না। পুনর্বার বলিল—মঙ্গরাজ মশায় বেঁধে এনেছেন।

। এই দাঁড়ি গোবরা জেনার সহি।

২ নম্বর সাক্ষী সনা রণা প্রথমে হাজির হইয়া কোনও কথা জানে না বলিয়া প্রকাশ করিল। দারোগা সাহেব বড় খাপ্পা হইয়া তাহাকে পাঠশালা ঘুরাইয়া আনিতে হুকুম দেওয়ায় সে দুইজন বরকন্দাজের হেপাজতে আধঘণ্টা বাদে আলু থালু চুল, ধুলামাখা গা, পিঠে হাতে গালে প্রহারের দাগ লইয়া হাজির হইয়া বলিল—হুজুর, আমি সব সত্য বলব। আমার নাম সনা রণা, বাপের নাম বনা রণা, জাতে মালী, বয়স ত্রিশ, পেশা গ্রাম-দেবীর পূজা আর চাষ। থাঃ গোবিন্দপুর। পঃ বালুবিশি। জেঃ কটক।

আমি শারিআকে চিনি, কি করে মরল জানি না। আজ প্রায় এক বছর কি দেড় বছর হবে একদিন সকালবেলা মঙ্গরাজ মশায় আমায় এক মজুরের মারফত ডাকিয়ে আমবনে নির্জনে আমাকে বললেন—দ্যাখ, সনা, তুই আমার একটা কাজ করে দে। আমার কথা শোন্, সে কাজটা করে দিলে তোকে ভাল নাবাল জমি দুই মাণ চষতে দেব; আর দু টাকা জল-পানি দেব। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি করব? কর্তাবাবু বললেন—এই যে ভগিআ তাঁতী, তার বউ ওই শারিআ হ'চ্ছে বাঁজা। ছেলে হওয়ার জন্য সে রোজ বুড়ী মঙ্গলাকে গড় করে। তুই গিয়ে তাকে বলবি—দেবী স্বপ্নে বলেছেন, 'তুই পূজো দে, দেবী স্বয়ং তোর সঙ্গে কথা বলবেন আর তোকে ছেলে দেবেন।' আমি গিয়ে দুই তিন বার ভগিআ ও শারিআকে কর্তাবাবু যেমন বোঝালেন তাই বললাম, তারা মন দিয়ে শুনল, কিন্তু কিছু জবাব দিল না। একদিন বিকেলে ভগিয়া আমাকে তার দুয়ারে ডেকে নিয়ে গেল, কি ভাবে পূজা দেওয়া হবে, কি কি দ্রব্য প্রয়োজন, কত খরচ পড়বে সব কথা জিজ্ঞেস করল। আমি তাকে সব বুঝিয়ে বললাম। পূজোর দ্রব্যসকল কেনবার জন্য তার কাছ থেকে সাড়ে দশ আনা পয়সা আনলাম। একদিন শনিবার সন্ধ্যার পর আমি, মঙ্গরাজ মশায়, জগা নাপিত আর কোদাল নিয়ে এক মজুর এই চারজনে মা

মঙ্গলার নিকটে গেলাম। কর্তাবাবুর কথামত মায়ের আস্থানের তলা থেকে পিছন দিকে একটা বড় গর্ত খোঁড়া হল; গর্তের মধ্যে জগা নাপিত লুকিয়ে রইল, গর্তের মুখ গাছের ডাল ও পাতা দিয়ে আড়াল করে রাখা হল। আমি খবর দিয়ে সকাল থেকে শারিআ ও ভগিআকে উপোস করিয়ে রেখেছিলাম, মাঝরাতে গ্রাম নিশুতি হলে তাদের ডেকে এনে পুজো দিলাম, তারপর ভোগ দিয়ে মায়ের অনেক স্তব স্তুতি করলাম। আমার কথামত শারিআ ও ভগিআ গলবস্ত্র হয়ে সটান উপুড় হয়ে পড়ে মায়ের কাছে ধর্না দিয়ে রইল। আমি আরও স্তুতি করে বললাম, 'মা মঙ্গলা! শারিআকে বর দাও মা, সে অনেক দিন হল তোমার সেবা করছে, অনেক লোককেই তো বর দিয়েছ, এদেরও দাও মা।' জগা গর্তের ভিতর থেকে জবাব দিল, "ওলো শারিআ, তুই অনেক দিন থেকে আমার পুজা করছিস, রোজ স্নান সেরে আমায় প্রণাম করে যাস, এক গণ্ডূষ জল দিস; আমি সে জল পাই। তোকে বর দিছি তোর তিনটি ছেলে হবে, আর তোর ঢের টাকা ঢের সোনা হবে, তুই আমার দেউল তুলে দে। কাল খুব ভোরে বাসি মুখে তোরা দুজনে তাঁতীঘাটে আসিস, আমার পুজার জবা ফুল যেখানে পড়ে থাকবে তার নিচে খুঁড়ে যা পাবি ঘরে নিয়ে রাখিস আর প্রতিদিন পুজো দিস। তাহলে তোকে সেই জিনিস থলে ভরে ভরে দেব। আমার আজ্ঞা না মানলে ভগিআর ঘাড় ভেঙে দেব।" শারিআ, ভগিআ দুইজনে শুনে ভয়ে কাঁপছিল, মুখে কথা সরছিল না। আমি পুজো সেরে তাহাদের কিছু প্রসাদ দিয়ে ঘরে পেঁৗছে দিয়ে এলাম বাকী প্রসাদ বাঁধলাম। আমি তাদের পেঁৗছে দিয়ে আসার পর জগা হাসতে হাসতে গর্ত থেকে বের হয়ে এলো। আমরা দুজনে গিয়ে কর্তাবাবুর দেওয়া একটি মোহর ঘাটের কাছে পুঁতে তার উপর জবা ফুল রেখে দিয়ে গেলাম। পরদিন আমি ভগিআর দোরে গেলাম। আমাকে দেখে তারা দুজন কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, আমরা দেউল কি করে তুলব উপায় বলে দাও। আমার কথা মত তারা তাদের ছয় মাণ আট গুণ্ঠ জমি মঙ্গরাজ মশায়ের কাছে বন্ধক দিয়ে টাকা নিল। সরকার থেকে জমাদার এসে ভগিআর ঘর ভেঙে দিয়ে গেল। মঙ্গরাজ মশায়ের মজুররা ঘর ভাঙল, জমাদার দাঁড়িয়ে ছিল; তাদের সব কিছু বয়ে নিয়ে গেল। ঘর ভাঙার দিন থেকে ভগিআ পাগল হয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়, শারিআকে সাত আট দিন হল মঙ্গরাজ মশায়ের খিড়কির দোরে বসে কাঁদতে আমি শুনেছি।

সওয়ালের জবাবে বলিল—মঙ্গরাজ মশায় ভগিআকে কত টাকা দিয়ে-

ছিলেন আমি জানি না, কেবল তমসুক রেজেস্টারি করবার জন্য কটকে নিয়ে যাবার সময় শারিআর জন্য একখানি শাড়ী কিনে দিয়েছিলেন আমি জানি। দেউল তোলার জন্য বিশ গাড়ী আন্দাজ পাথর মঙ্গরাজ মশায় মা মঙ্গলার কাছে নিয়ে ফেলেছেন। মঙ্গরাজ মশায় সেদিন আমাকে চার আনা পয়সা দিয়েছিলেন আর কিছু দেন নাই, আমি ভয়ে চাইনি। আমি আর কিছু জানি না।

(দস্তখত) সনা রণা।

৩ নম্বর সাক্ষী—আমার নাম মরুআ, বাপের নাম লক্ষ্মণ তিহাড়ি, জাতি ব্রাহ্মণ, বয়স জানা নাই, হাল সাঃ গোবিন্দপুর। জেঃ কটক।

সওয়ালের জবাব দিল—শারিআ কি রোগে মরল আমার জানা নেই। আজ আট দিন হল আমাদের খিড়কির দোরে বসে ছিল। দিনরাত একই জায়গায় বসে থাকে, যাকে দেখে ডাক পাড়ে—"আমার ছ' মাণ আট গুণ্ঠ, আমার ছ' মাণ আট গুণ্ঠ, আমার নেত-অ, আমার নেত-অ"—কেবল এই বলে ডাক পাড়তে থাকে। মাঠাকরুণকে দেখলে তাঁর পায়ে পড়ে, গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে। মাঠাকরুণও কাঁদেন। চম্পা তাকে তিনবার ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দিল। সে গেল না। সে আট নয় দিন হল কিছু খায় নি। মাঠাকরুণ নিজের ভাত একখানা কলাপাতায় তার কাছে রেখে দেন সে খায় না। ভাত কুকুরে নয় তো গরুতে খেয়ে যায়। কখনও কখনও মাঠাকরুণ বসে বলা-কওয়া করলে দুই এক গ্রাস খায়। মাঠাকরুণও সাতদিন হল খান নাই, খেতে বললে তিনি কেবল কাঁদেন। সেই জন্য আমি কিছু বলি না। সপ্তমীর দিন হবিষ্যি রেঁধে মাঠাকরুণ মঙ্গলার থানে যাচ্ছিলেন, সেই সময় শারিআ চীৎকার করায় হবিষ্যি ভাত তার সামনে রেখে দিলেন। তখন থেকে মাঠাকরুণ ঘরে এসে সেই যে পড়েছেন আর ওঠেন নাই। গত অষ্টমীর দিন তাঁর কাল হল।

সওয়ালের জবাব দিল—মাঠাকরুণের কি ব্যামো হয়েছিল জানি না। স্নান পূর্ণিমার আট দশ দিন আগে থেকে তাঁকে অল্প অল্প ব্যামোয় ধরেছিল। স্নান পূর্ণিমার দিন চম্পা কোথায় নাকি পালকি চেপে গিয়েছিল, এসে হেসে হেসে কি যেন বলল। সেই দিন থেকে মাঠাকরুণের ব্যামো বাড়ল, রাতে কিছু খান না, দিনেরবেলায় খাওয়া সেই রকমই, সব সময়েই কাঁদেন। শারিআর জমি ছেড়ে দেবার জন্য কর্তাবাবুর পায়ে পড়ে অনেক করে বললেন। কর্তাবাবু শুনলেন না। চম্পা রাগ করায় মাঠাকরুণ আর কিছু বললেন না, অন্ন ত্যাগ করলেন। কবিরাজের কাছ থেকে মুকুন্দ তাঁর ব্যামোর জন্য ওষুধ এনে দিয়েছিল। তিনি ওষুধ

খেলেন না, মাথায় ঠেকিয়ে রেখে দিলেন।

সওয়ালের জবাব দিল—আমি আজ দশ বছর হল এই বাড়িতে আছি। আমার বাপের বাড়ি পুরীর ব্রাহ্মণ শাসনে ছিল। আমার স্বামীর নাম টাগনাথ তিহাড়ি। শুনেছি বিবাহের সময় আমার বয়স হয়েছিল সাত, স্বামীর বয়স ছিল তিন কুড়ি চার বছর। আমার স্বামী তাঁর জমি বিক্রি করে আমার বাপকে আট কুড়ি টাকা দিয়েছিলেন। আমার স্বামীর শ্বাস-রোগ ছিল। সেই রোগেই তিনি মারা গেলেন। ঘরে আর কেউ ছিল না। বাবা গিয়ে তাঁর জমি বাড়ি বিক্রি করে আমাকে ঘরে নিয়ে এলেন। বাপের বাড়িতে পাঁচ সাত বছর ছিলাম। গ্রামে ললিতা দাস বাবাজী ছিলেন। আমি তাঁর কাছে চৈতন্যচরিতামৃত শুনতে যাওয়ায় ভাইয়েরা কোন্দল করল। আমি বৃন্দাবন যাবার জন্য বাবাজীর সঙ্গে একদিন রাতে পালিয়ে এসে কটকে তেলেঙ্গা বাজারে* ছিলাম। কর্তাবাবু মোকদ্দমার কাজে কটক গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে চলে এসে এই বাড়িতে আছি।

০ এই আংটি চিহ্ন মরুআর সহি।

৪ নম্বর সাক্ষী—আমার নাম বাইধর মহান্তি; বাপের নাম ডমবরুধর মহান্তি, জাতি করণ†, বয়স ৫৬ বৎসর, সাং কণকপুর, পঃ ঝঙ্কড়, জেঃ কটক।

আজ বিশ বছর হল আমি এই ফতেপুর সরষণ্ড তালুকে গোমস্তা। প্রথমে মেদিনীপুরের জমিদার ছিলেন কেরামত আলি, বর্তমান জমিদার রামচন্দ্র মঙ্গরাজ মিয়াদী বন্ধকের সূত্রে এই জমিদারি পেয়েছেন।

(দারোগা সাক্ষীকে অনেক জেরা করিলেন, সাক্ষীও অনেক জবাব দিলেন। সে সকল বাদ দিয়া আমরা সাক্ষীর জবাবের সার স্বরূপ কয়েকটি কথা বাছিয়া লিখিতেছি।)

সাক্ষীর জবাব—মঙ্গরাজ মশায় কিছু ঘরের কড়ি খরচ করে জমিদারি কেনেননি, উসুলের টাকা থেকে কিনেছেন। মঙ্গরাজ মশায় প্রথম বছর খাজনার টাকা আদায় করে জমিদার দিলদার মিঞাকে দিলেন। দোসরা কিস্তির টাকা উসুল করে গেলেন মেদিনীপুর। আমি সঙ্গে গেলাম। জমিদারকে বললেন, "পুরাতন জমিদার বাঘসিংহের বংশ বিদ্রোহ করায় খাজনা উসুল হল না, এখন কি হবে? কাল লাটবন্দি।" মঙ্গরাজ মশায় তমসুক লিখে নিয়ে খাজনার টাকা হাওলাত দিলেন। এদিকে জমিদার দেনা করেছেন বলে প্রজাদের কাছ থেকে সুদ নেন। প্রতি

* তেলেঙ্গা বাজার—কটক সহরের গণিকা পল্লী।

† করণ—বাংলার কায়স্থের তুল্য ওড়িশার জাতি-বিশেষ।

কিস্তিতে এরকম হয়। শেষবার মঙ্গরাজ মশায় মোসাহেবদের অনেক ঘুস দিয়ে সুদে আসলে ত্রিশ হাজার টাকার তমসুক লিখিয়ে নিলেন। দিলু মিঞা নেশার ঘোরে তমসুক দস্তখত করে দিলেন। মঙ্গরাজ মশায় মেদিনীপুর আর না গিয়ে কটকে মামলা করে জমিদারি দখল করলেন।

সওয়াল জবাবে বলিল—হাঁ, ভগিআ তাঁতীর কাছে ছয় মাণ আট গুণ্ঠ জমি কটকবালা করিয়ে নিয়েছিলেন। কবালায় দেড়শ টাকা লেখা আছে। তমসুক লেখাতে মকদ্দমার খরচ ইত্যাদিতে কত টাকা পড়েছে খাতা দেখলে বলতে পারি। (সাক্ষী খাতা দেখিয়া বলিল) মোট ৩৫।।৵১৭।।।

সাক্ষী বলিল—হাঁ, কর্তাবাবু ভগিআর নামে কটক আদালতে নালিশ করেছিলেন। মোকদ্দমার নোটিশ, ডিগ্রিজারী পরওয়ানা, নিলামী ইস্তাহার, সব আমার কাছে আছে, ভগিআকে কিছু দেওয়া হয় নাই। আদালতের পেয়াদা এসে কর্তাবাবুর নিকট বকশিশ নিয়ে আমাকে দিয়ে রসিদ লিখিয়ে নিয়ে চলে যায়। শারিআ কি করে মরল তা আমি জানি না। এই গাইটা ভগিআর।

(স্বাক্ষর) বাইধর মহান্তি।

৫ নম্বর সাক্ষী—আমার নাম চম্পা, বাপের নাম জানা নাই, জাতি এই বাড়ির মানুষ, সাঃ গোবিন্দপুর, জেঃ কটক—আমি শারিআকে চিনি না, তার ঘর এ গাঁয়ে নয়, সে আমাদের দোরে মরেনি, আর কোথাও মরে আমাদের দোরে পড়েছিল, তার জ্বর হয়েছিল, মরে গেল। আমাদের কর্তাবাবু তাকে কিছু বলেননি। কর্তাবাবু বড় ভাল লোক, কারও সাতে পাঁচে নাই। মাঠাকরুণের জ্বর হয়েছিল, তিনি মারা গেলেন। তাঁর জন্য আমি ভাত ছেড়েছি, কেবল কাঁদছি। (সাক্ষী কাঁদিতে বসিল, দারোগা ধমক দেওয়াতে চুপ করিল।) এই গাইটা আমাদের বাড়ির বাছুর, পুনর্বার বলিল—শারিআকে টাকা দিয়ে আমরা কিনেছি।

o এই আংটি চিহ্ন চম্পার সহি।

অনেক রাত্রি হওয়ায় কাছারি বন্ধ হইল। দারোগা, মুনশী ও চৌকিদার গোবরা জেনা অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসিয়া পরামর্শ করিলেন। উপযুক্ত সাক্ষী ঠিক করিয়া তাহার পরদিন আবার জবানবন্দি আরম্ভ হইল।

৬ নম্বর সাক্ষী—আমার নাম বনা জেনা, বাপের নাম দনা জেনা, জাতি পাণ, বয়স ১৮; পেশা ক্ষেতমজুরি। সাং মক্রামপুর। পঃ বালুবিশি। জেঃ কটক। আমি শারিআকে চিনি, তার দোরে অনেকবার গেছি। তার ঘর সউতুনিয়া। মৌজা ব্রাহ্মণ সাহি, না না পাণ সাহি। পুনর্বার বলিল, না না এই গ্রামে। রামচন্দ্র মঙ্গরাজ আজ আটদিন হল তাকে ধরে এনে

মেরেছিলেন। এই বাঁশের লাঠিতে মারতেন (সাক্ষী লাঠি দেখাইয়া দিল)। গত দ্বাদশীর দিন মাঝরাতে রামচন্দ্র মঙ্গরাজ মারছিলেন দেখেছি। শারিআর পিঠে বিশ ঘা মারলেন। আমি সাউদের বাড়ির গরু খুঁজতে এসেছিলাম। আমার ঘর এখান থেকে দুই কোশ পথ। কর্তাবাবুর সঙ্গে আমার বিবাদ নেই। গোবরা জেনা চৌকিদার আমার ভগ্নিপতি নয়।

। এই যষ্টি চিহ্ন বনা জেনার সহি।

৭ নম্বর সাক্ষী—আমার নাম ধকেই জেনা, বাপের নাম নাঙ্গুড় জেনা, জাতি পাণ, বয়স জানা নাই, পেশা ক্ষেতমজুরি। সাং রাইপুর। পঃ বালুবিশি। জেঃ কটক।

গত নবমীর দিন মাঝরাতে প্রতিবাদী রামচন্দ্র মঙ্গরাজ এই বাঁশের লাঠিতে শারিআকে মারছিলেন আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমি নুন কিনতে দোকানে এসেছিলাম, রাত হয়ে যাওয়ায় দোকানের দাওয়ায় আমি শুয়েছিলাম। গুম গুম শব্দ শুনে আমি দোকানের চালে উঠে দেখলাম। পুনর্বার বলিল—না না, আমি মঙ্গরাজের বাড়ির চালে উঠে দেখলাম। বেশ দেখা যাচ্ছিল। এই গাই আমি চিনি, নিজে অনেকবার একে দুয়েছি। এই গায়ের নাম বউলা*। এ গাই ভগিআ তাঁতীর। রামচন্দ্র মঙ্গরাজ তার ঘর থেকে চুরি করে এনেছেন, সিঁধ কেটে চুরি করে এনেছেন।

প্রতিবাদীর সওয়ালে জবাব দিল—গোবরা জেনা আমার মাসতুত ভাই নয়। সে আমাকে ডেকে আনেনি। আমি সাক্ষী হবার জন্য নিজের ইচ্ছায় এসেছি। সে আমায় খাওয়ায় না। আমি বাড়ি থেকে চাল চিড়া বেঁধে এনেছি। নবমী আজ কুড়ি কি বাইশ দিন হল গেছে। আজ কি তিথি আমার জানা নেই।

। এই যষ্টি চিহ্ন ধকেই জেনার সহি।

৮ নম্বর সাক্ষী—আমার নাম খতু চন্দ, বাপের নাম নিতা চন্দ। জাতি তাঁতী, বয়স ২৮, পেশা কাপড় বুনা, সাং গোবিন্দপুর। জেঃ কটক।

এ গাই ভগিআর তা জানি। ভগিআ আমার পড়শী। যেদিন সরকারী জমাদার এসে ভগিআর ঘর ভেঙ্গে দিল সেদিন মঙ্গরাজ মশায় গাই বেঁধে এনে বাড়িতে রেখেছেন। কি জন্য গাই বেঁধে আনলেন তা আমার জানা নেই। মঙ্গরাজ মশায়ের মজুরেরা গিয়ে ভগিআর ঘর ভেঙ্গে ফেলে ঘরের সব জিনিস বয়ে আনল। ভগিআ শারিআ দুইজনে ডাক পেড়ে রাস্তায় পড়ে লুটোচ্ছিল। সরকারী জমাদার

* বউলা॥ 'বকুল'-এর অপভ্রংশ 'বউল' (উচ্চারণ অ-কারান্ত), বাৎসল্যে 'বউলা'। এই ল-এর উচ্চারণ 'ল' ও 'ড়'-এর মাঝামাঝি।

আসাতে আমরা দোরে খিল দিয়ে ঘরে লুকিয়েছিলাম। আমি দোরে খিল দিয়ে কবাটের ছিদ্র দিয়ে দেখছিলাম। চৌকিদার গোবরা জেনা আমায় ডাকছিল। আমি জবাব দিলাম না। আমার স্ত্রী জবাব দিল, আমি ঘরে নেই বলে দিল।

() এই নৌকা চিহ্ন খতু চন্দের সহি।

জবাব আসামী রামচন্দ্র মঙ্গরাজ—পিতার নাম ধনী নায়ক, জাতি খণ্ডায়ত, বয়স ৫২, পেশা জমিদারি। সাঃ গোবিন্দপুর, জেঃ কটক।

জবাব দিল—আমি শারিআকে মারিনি। ভগিআ আমার কাছ থেকে টাকা হাওলাত নিয়েছিল, নালিশ করে তার ছয় মাণ আট গুণ্ঠ জমি বিক্রি করিয়ে নিয়েছি, মোকদ্দমার খরচা বাবদ তাহার গাই নিয়েছি।

(স্বাক্ষর) রামচন্দ্র মঙ্গরাজ।

ঠিক এই সময়ে এক পাগল সেখানে উপস্থিত হইল। কোমরে এক-খানা ছেঁড়া নেকড়া জড়াইয়া রাখিয়াছে, মাথার চুল আলু থালু, সারা শরীরে ধুলা কাদা, হাতে একটা বাতিল করা হাঁড়ি, খুব নাচিল, শারিআ শারিআ বলিয়া গান গাহিল। তাহাকে দেখিয়া গাঁয়ের লোকে হায় হায় করিয়া বলিল, "আরে ভগিআ, তোর কপালে এই ছিল!" মঙ্গরাজের উপর নজর পড়িয়া যাওয়াতে পাগল তাহাকে কামড়াইতে গেল। চৌকি-দাররা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, সামলাইতে না পারিয়া দারোগার হুকুমে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

দারোগা মামলার তদন্ত শেষ করিলেন। বত্রিশজন সাক্ষীর জবানবন্দি হইল। তাহা হইতে চারিজনকে বাহাল রাখিয়া অন্যান্য লোকদের বিদায় করিয়া দিলেন। হুকুম দিলেন—আসামী চালান।

বেলা এক প্রহর নাগাদ মঙ্গরাজ চালান হইলেন। হাতে হাতকড়ি, চৌকিদার বরকন্দাজ ঘিরিয়া রহিয়াছে, মাঝখানে মঙ্গরাজ মহাশয় মাথায় একখানি গামছা ফেলিয়া মাথা নিচু করিয়া চলিয়াছেন। গ্রামের লোকেরা হাঁ করিয়া যাত্রা দেখিবার মত দাঁড়াইয়া চাহিয়া আছে। সামনে দারোগা, পিছনে মুনশী। মঙ্গরাজের এই দুর্দশা দেখিয়া গ্রামের কেহ ব্যাকুল হইয়াছিল কি না আমরা ঠিক বলিতে অক্ষম। কেবল চম্পা "আমার কর্তাবাবু, আমার কর্তাবাবু, আমার কর্তাবাবুকে কোথায় নিয়ে যাও, আমার কর্তাবাবু গো" ইত্যাদি করুণ রাগিনীতে ডাক পাড়িয়া যখন দৌড়াইতেছিল তখন পথে লোক জমিয়া উঠিতেছিল। কর্তাবাবু পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দুই তিন বার তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। দারোগা, মুনশী জ্বালাতন হইয়া গেলেন তবু সে শোনে না। মাথায় কাপড় নাই,

কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। এইরূপে দুই ক্রোশ গিয়া মঙ্গরাজকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল, "তোশাখানার জিনিষগুলোতে যে উই ধরে যাবে, ইঁদুরে খাবে, কি হবে?" মঙ্গরাজ একটু দাঁড়াইয়া লম্বা লম্বা দুইটা চাবি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "সব সাবধানে রাখিস্, কিছু চিন্তা করিস্ না।" চম্পা চাবি দুইটা খুব সাবধানে কোমরে গুঁজিয়া বলিল, "আপনি পেটে কিছু দেবেন, উপোস করে থাকবেন না।" গোবিন্দা নাপিত সঙ্গে সঙ্গে ছিল। দুইজন মিলিয়া ঘরে ফিরিল। ফিরিবার সময় চম্পার ক্রন্দন কেহ শুনে নাই।

দারোগা সাহেব থানায় পৌঁছিয়া সাক্ষী জবানবন্দি সমস্ত পুনরায় একবার শুনিয়া মুনশীর মরামর্শ অনুসারে কাটা ছাঁটা করিয়া সাক্ষী-দিগকে সদুপদেশ দিলেন। তারপর রিপোর্টের সহিত আসামীকে কটক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সকাশে চালান দিলেন। আমরা দারোগা সাহেবের রিপোর্টের এক প্রস্থ সই মোহর নকল উদ্ধার করিয়াছি। আপনাদের ইচ্ছা হইলে শুনুন।

দারোগার রিপোর্টের নকল।

ধর্মাবতার

চলিত অক্টুবর মাসের তিন তারিখ ভোর আঠ বাজে অত্রাধীন আপন এলাকার মধ্যে আপন কাছারিতে বসিয়া সরকারী কাজ আঞ্জাম করার ওক্ত্—মুনশী চক্রধর দাস বান্দার ডাহিন দিকে বসিয়া রোজিন ডায়েরি কলমবন্দ করার ওক্ত্—বরকন্দাজ গোলাম কাদের ও হরিসিং আপনাপন পাহারা মোতায়েন থাকা ওক্ত্—অত্র থানা ইলাকা ফতেপুর সরষণ্ড মৌজা গোবিন্দপুর চৌকিদার গোবরা জেনা হাজির জাহির করিল তালুক মজকুর মৌজা মজকুর রহিস্ শারিআ নামক তাঁতিনী খুন হইয়াছে— বান্দা এই রিপোর্ট পাইবা মাত্র এক্ লহমা গুজরাণ না করিয়া হুজুরকে প্রথম এত্তেলা দিয়া আসামী এক জমিদার ও নামজাদা বদমায়েস এবং জুলুমবাজ হওয়ায়—এবং মামলা ভারী সঙ্গিন বিধায় বান্দা তুরন্ত্ অকুস্থানে রওয়ানা হইয়া সরজমিনে পৌঁছিয়া দস্তুর মুতাবেক আসামীর ঘর বাড়ি সম্পূর্ণরূপে খানাতল্লাস করিয়া বহুত হুশিয়ারিতে আসামীকে গ্রেফতার করার পর মহিলুকিআ (মৃত) শারিআর লাশ এবং তাহার ঘরের মাল আসবাব ও মৃতের নেত নামক ধবধবে সফেদা গাই আসামীর জিম্মা হইতে জব্দ করিয়াছি—আসামী যে বাঁশের লাঠিতে শারিআকে খুন করিয়াছে সেই লাঠিও জব্দ হইয়াছে—আসামী রামচন্দর মঙ্গরাজ আপসে একখানা বাঁশের লাঠিতে শারিআকে খুন করিয়াছে ইহা চারিজন

সাক্ষীর জবানবন্দিতে সাফ সাবিত—ইহারা যে নিজের চোখেই দেখিয়াছে তাহা সাফ সাবিত—আসামী যে একজন জুলুমবাজ, ইমানদার মুসলমানের জমিদারি জুয়াচুরি করিয়া লইয়াছে তাহা চার নম্বর সাক্ষীর জবানবন্দী হইতে সাফ সাবিত—এই সব হাল লিহাজ করিয়া আসামী খুন করিয়াছে সাবিত হওয়ায় হুজুরে চালান দিলাম—হুজুর খোদাবন্দ মা বাপ দুনিয়ার বাদশা রিপোর্টের কসুর মাপ হয়, নৌসনারী তজ্‌বিজ্‌ হয়।

১০ তারিখ অক্টোবর, সন ১৮৩১

দারোগা ইনায়েৎ হোসেন

থানা কেন্দ্রাপাড়া।

জাহির থাকে কি আলাহিদা ফর্দ মুতাবেক আসামীর ঘর হইতে জব্দ চোরাই মাল হরি সিং বরকন্দাজের হেফাজতে পাঠানো হইল। আসামী শারিআকে খুন করায় এগুলির মালিক ভগিয়া চন্দ বন্ধ উন্মাদ হইয়া লোকের উপর জুলুম করায় এগুলির হেফাজতের জন্য কোনও আপন লোক না থাকায় হুজুরে চালান দিলাম, হুজুর মালিক।

তারিখ সন পনের।

২০ ॥ উকিল রাম রাম লালা

কাঠের রেলিং-এর বেড়া দেওয়া নজরখানার গারদ ঘরের এক কোণে বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া একটি আসামী বসিয়া আছে। চারিজন বরকন্দাজ পাহারা। আহা! লোকটার সহিত দু'টা কথা কহিবারও কেহ নাই। সকলেই সুখের সাথী, অর্থের দাস, অসময়ে কেহ কাহারও নহে। পাঠক দেখিতেছেন কাহারও দুয়ারে আগাছা গজাইতেছে, আবার কাহারও দুয়ারে লোকের ভীড়। অবস্থাই সব করায়। জনৈক বিলাতী কবি বলিয়াছেন, সূর্যহীন জগৎ ও বন্ধুহীন জীবন সমান। এই জন্য মানুষকে বন্ধু ছাড়িতে পারে না। 'দণ্ডবৎ মঙ্গরাজ মশায়', আসামী চমকিয়া চাহিলেন। পূর্বে তিনি ঢের ঢের দণ্ডবৎ শব্দ শুনিয়াছেন, কিন্তু আজ সেই শব্দটি শুনিয়া তাঁর ধড়ে কিছু প্রাণ আসিল বলিয়া মনে হইল। বন্দী কিছু বলিতে না পারিয়া সেই মূর্তির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। বিশাল মূর্তি, আজানুলম্বিত বাহু, গায়ে ঢিলাহাতা ছয় কলিওয়ালা ফিতা বাঁধা, স্থানে স্থানে মসীচিহ্নিত সুদীর্ঘ চাপকান, এক হাত চওড়া চব্বিশ হাত লম্বা জরি আঁচলা চাদর মাথায় পাগড়ি করিয়া বাঁধা, এবং পিছন হইতে ঘুরাইয়া আনিয়া বাঁ খুঁট ডান কাঁধে ও ডান খুঁট বাঁ কাঁধে বুকের উপর ঢেরা কাটিয়া পড়িয়াছে; তিন ফুলী মাণিয়াবন্দের ধুতি পরনে, পায়ে ফুলকাটা মারাঠী জুতা, কানে শরের কলম, জোড়া গোঁফ, এক গালে পান বোঝাই। সেই মূর্তি দেখিয়া আশা ভরসা বিস্ময় সন্দেহ আসামীর মনকে মথিত করিতেছে। মুখে কথা সরিতেছে না। চেনা জানা, ও স্নেহপরায়ণ লোকের মত দণ্ডবৎ হইলেন, ইনি কে? আমরা অনুমান করি ইনি কোনও বন্ধুলোক হইবেন। চাণক্য-শাস্ত্রে আমাদের বিশেষ জ্ঞান থাকায় এরূপ মীমাংসা করিতে সাহস করিতেছি। শাস্ত্রে আছে, "রাজদ্বারে শ্মশানে চ য তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।" রাজদ্বারে অর্থাৎ কিনা কাছারিতে, শ্মশানে অর্থাৎ যেখানে শবদাহ করা হয়, তিষ্ঠতি মানে থাকে, সবান্ধবঃ অর্থাৎ উকিলরা কাছারিতে ও শিয়ালরা শ্মশানে বিরাজ করে, ইহারা বান্ধব। কেবল প্রভেদ হইতেছে জীবিত ও মৃত সম্পর্কে। আসামীকে বেশীক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিতে হইল না। পাহারাদার বরকন্দাজ গোপী সিংহ চিনাইয়া দিল, "দেখ, ইঁহার নাম রাম রাম লালা, কাছারির বড় উকিল, ইঁহাকে ভাল

করিয়া ধর। সাহেব ইঁহার কথা খুব শুনেন।” উকিলবাবু খুশী হইয়া বুক ও দুই বাহুতে দুইবার চোখ বুলাইলেন, দুইবার গলা খাঁকারি দিয়া পুরানো দরদী মানুষের মত বলিলেন, “মঙগরাজ মশায়, মামলাটা এতদূর গড়িয়ে গেল, আগে একবার আমায় খবর দিলেন না? যত মামলা তো আমারই হাতে, থুতু ফেলবার ফুরসৎটুকুও দেয় না লোকেরা, তবু আপনার নাম যেমন কানে গেল, দৌড়ে এলাম।” মঙগরাজ মহাশয় ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, হাত জোড় করিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইলেন। উকিল—“উঠুন উঠুন, এখন থেকে সব ভাবনা আমার, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন, কোনও চিন্তা নাই। কাল রাত্রে সাহেবের কুঠিতে গিয়েছিলাম, বহু মামলার কথা উঠল, আপনার কথা আমার জানা থাকলে আজ কি না কি করে ফেলতাম। আপনার মোকদ্দমার হাল আমি জানি, সব খবর নিয়েছি, সব মিথ্যা, সব মিথ্যা, সব মিথ্যা। সেই যে মুখপোড়া দারোগা তারই সব কারসাজি। সেই দারোগার হাল আমি কি করি দেখবেন। একবার সাহেবের সঙ্গে কথা হোক।” মঙগরাজ (হাত জুড়িয়া)—“উকিল সাহেব, আমি কি করব, আমাকে বাঁচান, আমায় প্রাণ দিন, আপনি আমার ধর্মবাপ, আমি ছেলে মানুষ, ছেলে মানুষী বুদ্ধি, এখন আপনিই ভরসা।” উকিল—“আপনাকে বলতে হবে না, আমি তো সব জানি, সব করব। তবে একটা কথা কি জানেন, মামলাটা কিছু কঠিন—খুব কঠিন—ফাঁসির মামলা, সময় থাকতে ব্যবস্থা না করলে নির্ঘাত ফাঁসি। আবার সেই মুখপোড়া দারোগা পিছনে লেগে আছে। আপনি বুদ্ধিমান্ লোক অধিক কি বলব, কাছারির মামলার কথা সবই আপনি জানেন, কিছু খরচ লাগবে—খরচ করতে পিছপা হলে চলবে না, হাত খুলতে হবে। দারোগা কি বলে বেড়াচ্ছে শুনেছেন তো? ফাঁসির মোকদ্দমা, প্রাণ থাকলে আর সব। টাকা আপনি উপায় করেছেন না টাকা আপনাকে উপায় করেছে? আপনি এ দুটোর কোনটি ঠিক তা ভাবুন দেখি।”

মঙগরাজ (কাঁদিতে কাঁদিতে)—“আজ্ঞে, এতে কত টাকা লাগবে? আমার হাতে তো একটি পয়সা নেই, সঙ্গে কোনও লোক নেই। যে গোমস্তা চাকর এসেছে দারোগা তাদের আমার সঙ্গে কথা বলতে দেয়নি। আমায় খালাস করে দিন, ঘরে ফিরে গেলে এক হাজার টাকা আপনাকে দেব।”

গোপী সিংহ—“ওহে মঙগরাজ মশায়, তুমি কি এই বুদ্ধিতে জমিদারি করছিলে? এখানে কি কেনা বেচার কথা যে ধার কর্জ চলবে? ‘মক্কেল

বলে রাখ মউসা* উকিল বলে আন পয়সা।' ফেল কড়ি, মাখ তেল। টাকা বার কর, টাকা বার কর, মামলা জিতবে তো টাকা বার কর। উকিল সাহেব আমি আর আসামীর সঙ্গে কথা বলতে দেব না। নাজির কেবল দুটি কথা বলবার হুকুম দিয়েছিলেন। আমি কিছু একলা নই, আমরা বারো জন।"

উকিল—"শুনলেন তো মঙ্গরাজ মশায়! সহজ কথা নয়, বরকন্দাজ থেকে হাকিম পর্যন্ত সবাইকে হাত করতে হবে। মামলা যেমন কঠিন আর কোনও উকিল হলে নগদ দশ হাজার নিয়েও এতে হাত দিতে পারত না, আমি বলে হাত দিচ্ছি। আপনি যখন ধর্মবাপ বলে ডেকেছেন তখন কি আর ভাসিয়ে দেব? আচ্ছা, এই মামলায় যত টাকা লাগবে আমি খরচ করব, এতে তো দশ হাজারের এক পয়সাও কম হবে না। আপনার জমিদারি আমায় কট-কবালা করে দিন। সব টাকা যে এখনই খরচ হয়ে যাবে এমন নয়। আপনি খালাস হলে আমি কড়া ক্রান্তি হিসেব বুঝিয়ে দেব।"

মঙ্গরাজ গালে হাত দিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া কি ভাবিলেন। সাপের পা সাপেই দেখিতে পায়।† কট-কবালার অর্থ মঙ্গরাজ বিলক্ষণ জানেন। তবে মানুষ যখন ভাসিয়া যায় তখন বাঘের লেজও আঁকড়াইয়া ধরে।

উকিল রাম রাম লালা করিতকর্মা লোক। দুই ঘণ্টার মধ্যে ষ্ট্যাম্প কাগজ কিনিয়া কবালা মুসাবিদা, সাফ নকল শেষ করিয়া কাছারিতে রেজেস্টারি অপিসে কবলা রেজেস্টারি সমাপ্ত করিলেন। উকিল সাহেব শেষে বলিলেন—"মঙ্গরাজ মশায়, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে এই হাজত-খানায় বসে থাকুন, আমি আছি চিন্তা নেই।"

* মউসা॥ মেসো; অনাত্মীয়কে আত্মীয় সম্বোধন কালে বাঙ্গালী বলে খুড়ো, ওড়িয়া বলে মউসা।

† ওড়িয়া প্রবাদ।

২১ ॥ কটক সেশন জজকোর্ট

আজ জজকোর্টে বেজায় ভিড়! কাছারির লোক, হাটের লোক, বাজারের লোক সকলেই দেখিতে ছুটিয়াছে। কোথাও বাদীপালা* হইলে দর্শকগণ যেমন পালাগায়কদের বেশভূষা না হইতেই আসিয়া জমায়েৎ হয়, তেমনি এক-এক জন করিয়া আসিয়া কাছারি ভরিয়া ফেলিয়াছে। বেজায় ভিড়, ভারী গোলমাল, দুইজন চাপরাশী চো—ও—প্ চো—ও—প্ করিয়া আরও গোলমাল বাড়াইতেছে। মফস্বলের একজন মাতব্বর জমিদার খুনের দায়ে চালান ·হইয়া আসিয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দায়রা সোপরদ্দ করিয়াছিলেন; পাঁচ দিন হইল মোকদ্দমা চলিয়াছে, আজ বিচারের শেষ দিন। মামলা এখনও পড়ে নাই। কাল বুধবার বিলাতী মেল যাইবে, সাহেব 'মাই ডিয়ার লেডি' বলিয়া আরম্ভ করিয়া তাড়াতাড়ি একখানি চিঠি লিখিয়া ফেলিতেছেন। ফৌজদারী মামলা পড়িলে হাকিম সাহেব বিলাতী ছাপা কাগজ মেলিয়া বসেন অথবা চিঠি লেখা আরম্ভ করেন, সব কাজ পেশকারের জিম্মায় থাকে। সাহেব জবানবন্দির কাগজে এক একটা দাগ টানিয়া দস্তখত করা ও রায় শুনাইবার মালিক। আজ সব কাজ সাহেবকে হাতেই করিতে হইবে, কারণ আজ সাক্ষী একজন ইংরাজ, ইংরাজীতে রায়ও লিখিতে হইবে। আজকালকার সব ইংরাজী কারখানা, কিন্তু আমরা ওড়িয়া, পাঠকগণও তাহাই, ছাপাখানার হরফগুলাও এই দেশী, সুতরাং সকল কথা তরজমা করিয়া লিখিতে হইতেছে। সাহেব একরাশ থুতু লাগাইয়া লেফাফা বন্ধ করিয়া চাপরাশীর হাতে ডাকঘরে পাঠাইয়া দিয়া কহিলেন—"ওয়েল বাবু, মোকদ্দমা পেশ কর।" সরকার তরফের উকিল ঈশানচন্দ্র সরকার এবং পুলিস দারোগা ইনায়েৎ হোসেন—প্রতিবাদী তরফের উকিল রাম রাম লালা হাজির।

আসামী রামচন্দ্র মঙ্গরাজ—আসামী কাঠগড়ার ভিতর জোড় হাতে দাঁড়াইয়া আছেন। জজ সাহেবের ডান পাশে চেয়ারে বসিয়া 'হোলি বাইবেল' হাতে নিয়া ডাক্তার সাহেব জবানবন্দি দিলেন—

আমার নাম এ বি সি ডি ডগলাস, পিতার নাম ই এফ্ জি এইচ্ ডগলাস্, জাতি ইংরাজ, বয়স ৪০, হাল সাকিন কটক। আমি কটক

* বাদীপালা ॥ ওড়িশার এক প্রকার পালাগান, তাহাতে এক পক্ষের পালা শেষ হইলে অপর পক্ষ পালা গাহিয়া তাহার উত্তর দেয়। বাঙলায় কবিগান বিশেষ।

জেলার সিভিল সার্জন। গত ৮ তারিখ ভোর সাতটা ত্রিশ মিনিটের সময় সরকারী ময়না ঘরে আমার সাক্ষাতে শারিআর লাস পোস্টমর্টেম এক-জামিন করা হইয়াছে। চৌকিদার গোবরা জেনা সনাক্ত করা অনুসারে বলিতেছি তাহা শারিআর লাস ছিল। আমি যতদূর পরীক্ষা করিয়াছি সাহস করিয়া বলিতে পারি কোনও প্রাণনাশক অস্ত্র বা অন্য পদার্থ ইহার মৃত্যুর কারণ নহে। দীর্ঘকাল উপবাসে রহিয়া বিশেষ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মরিয়া গিয়াছে বলিয়া আমি যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি।

জজ সাহেবের সওয়ালে সাক্ষী জবাব দিলেন—লাসে কোনও পীড়ার লক্ষণ ছিল না, অথচ তাহার শরীরের রক্ত শুকাইয়া গিয়াছিল, হৃদ্‌পিণ্ডে প্রায় রক্ত ছিল না। পাকস্থলী প্রায় শূন্য ছিল। মূত্রস্থলী ও জলাশয়ে কোনও পদার্থ ছিল না। এই সমস্ত লক্ষণ হইতে জানিতেছি সে উপবাসে মরিয়াছে।

সরকারী উকিলের সওয়ালের জবাব—হাঁ, লাশের পৃষ্ঠদেশে তিন জায়গায় চিহ্ন ছিল তাহা গোবরা জেনা আমাকে বিশেষ রূপে দেখাইল। আমিও উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি তাহা প্রহারের চিহ্ন নহে, প্রাণত্যাগের পর গরম লোহা কিম্বা অন্য কোনও আগ্নেয় পদার্থ দ্বারা দাগ দিলে যেরূপ চিহ্ন হয় ইহা সেইরূপ ঈষৎ পোড়ার চিহ্ন।

পুনর্বার সরকারী উকিলের সওয়ালে—না, আমি নিজে ছুরি দিয়া শব কাটি নাই, নেটিভ ডাক্তার গৌরাঙ্গ কর ও কম্পাউন্ডার বাসুদেব পট্টনায়ক দুইজন আমার সাক্ষাতে শব ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন।

পুনর্বার উকিলের সওয়ালে কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিলেন,—আমি আজ সাড়ে দশ বৎসর ধরিয়া সিভিল সার্জনের কাজ করিয়া আসিতেছি, প্রথমে মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টে ছিলাম, লণ্ডন কলেজে ডাক্তারি পড়িয়া পাস করি।

পুনর্বার সওয়ালের জবাব দিলেন—প্রথমে আমি হস্‌পিটাল অ্যাসিষ্ট্যান্ট ছিলাম, বর্মাযুদ্ধে আমার প্রমোশন হইয়াছে।

জজ সাহেব আসামীর উকিলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তুমারা কুছ সওয়াল হ্যায়?

আসামী তরফের উকিল রাম রাম লালা ডাক্তার সাহেবের দিকে চাহিয়া সওয়াল করিলেন—আচ্ছা, আদালতে আসামীর এই যে বাঁশের লাঠিটি রয়েছে এই লাঠির কোনও দাগ লাসের পিঠে ছিল কি?

জজ সাহেব—নন্‌সেন্‌স্‌! আউর ক্যা পুছনেকো হ্যায় পুছো।

উকিল সাক্ষীকে পুনর্বার জেরা করিলেন—আচ্ছা, আপনি বলছেন

শারিআ উপোস করে মরেছে, সে নিজে উপোস করেছিল না আসামী তাকে উপোস করিয়েছিল?

জজ সাহেব—কুছ বাত্ নেহি, গো অন্, চলো চলো।

পুনর্বার জেরা—আচ্ছা, শারিআ আসামীর দোর গোড়ায় মরবার কোনও প্রমাণ আছে?

জজ সাহেব মহা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—দেখো, তুম এসা বেহুদা সওয়াল করো গে ত তুমারা ওকালতি ক্যানসেল কর দেগা।

উকিল—হুজুর খোদাবন্দ্, মা বাপ, দুনিয়াকা বাদশা।*

আসামীর জবাব নেওয়ার পর দুই পক্ষের উকিলের বক্তৃতা হইল, ভারী ঝুটাপুটি লাগিল, অন্যূন আড়াই ঘণ্টা কাল বক্তৃতা চলিল। এই অবসরে সাহেব প্রায় চার হাত লম্বা একটি ছাপা কাগজ পড়িয়া ফেলিয়া টিফিন খাইয়া আসিয়াছেন। হাকিম বন্ধ না করিলে বক্তৃতা বরাবর চলিত।

হাকিমের হুকুম অনুসারে সেরেস্তাদার রুবকারি লিখিয়া প্রকাশ করিলেন। আধ দিস্তা কাগজে তাহা লেখা হইল। রুবকারি লিখিয়া প্রকাশ করিতে তিন দিন লাগিল। আমরা তাহার সই-মোহর নকল উদ্ধার করিয়াছি, কিন্তু আমরা সমস্ত কথা সংক্ষেপে বলিয়া আসিতেছি তাই রুবকারির যেটুকু প্রকাশ করিলে পাঠক মোকদ্দমার সমস্ত হাল বুঝিতে পারিবেন আমরা সেইটুকু সার অংশ মাত্র প্রকাশ করিতেছি।

রুবকারি কাছারি আদালত ও ফৌজদারি সেশন্ জজকোর্ট এজলাস এইচ্ আর জ্যাক্সন্ এস্কোয়ার সেশন্ জজ মিলিকিয়ৎ শ্রীযুত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুর ওড়িশা খণ্ড জেলা কটক।

সরকার বাহাদুর বাদী বনাম রামচন্দ্র মঙ্গরাজ সাঃ গোবিন্দপুর পঃ অসুরেশ্বর জেঃ কটক প্রতিবাদী। শারিআ নামক একটি তাঁতিনী স্ত্রীলোককে হত্যা করা এবং তাহার ঘরের আসবাব লুঠতরাজ করিয়া লইবার মামলা। নথির সমস্ত কথা কাগজাৎ এবং দুই পক্ষের সমস্ত কথা, উকিলদিগের সওয়াল-জবাব দৃষ্টি ও শ্রবণে আসিবার পর জানা গেল যে ইহা পুলিস চালানী মোকদ্দমা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসামীর উপরে নরহত্যার অভিযোগ আনিয়া এই মোকদ্দমা সেশন সোপরদ্দ করিয়াছেন। আসামীর দোষ সাব্যস্ত করিবার জন্য পুলিস আটজন সাক্ষীর জবানবন্দি লইয়াছে। আমরা সাক্ষীদিগকে অতি সতর্কতা এবং মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়াছি এবং উভয় পক্ষের উকিলের বক্তৃতা

* মাননীয় উকিল পাঠক—আপনি ভুলবেন না, এ মামলাটা ষাট বছর আগেকার।
—লেখক

শ্রবণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে আসামী পুলিস কথিত মতে বাঁশের লাঠিতে প্রহার করিয়া শারিআকে হত্যা করে নাই, তাহার মৃত্যুর কারণ দীর্ঘকাল উপবাস এবং মনোকষ্ট। আমাদের এরূপ বিশ্বাসের হেতু এই যে—প্রথম—নরহত্যা মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষী সিভিল সার্জন সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন লাসে কোনও প্রকার আঘাতের চিহ্ন ছিল না।

আমরা সাক্ষীদিগের দ্বারা যথেষ্ট প্রমাণ পাইতেছি যে এই মোকদ্দমাটি সম্পূর্ণরূপে সাজানো মোকদ্দমা বটে। আমাদের বিশ্বাস ইহার সূত্রপাত করে প্রথম রিপোর্টকারী গোবরা জেনা চৌকিদার। তাহার প্রথম রিপোর্টের সহিত শেষ জবানবন্দি মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় সে মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া আদালতে কূট প্রশ্নে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছে। মোকদ্দমার প্রত্যক্ষ সাক্ষী বনা জেনা এবং ধকেই জেনা যাহারা আসামী বাঁশের লাঠিতে শারিআকে মারিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া বয়ান করিতেছে তাহারা চৌকি-দারের আত্মীয়, তাহাদের ঘর আসামীর ঘর হইতে দুই ক্রোশ দূর, অর্ধরাত্রে জাগিয়া উঠিয়া আসামীর কার্যকলাপ দেখা নিতান্ত অসম্ভব। পুলিস, মামলার অকুস্থলের যে নকশা দাখিল করিয়াছে তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যেস্থানে দাঁড়াইয়া আসামী শারিআকে হত্যা করে বলা হইয়াছে এবং অন্য সাক্ষীরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ করে তাহার মধ্যে তিন প্রস্ত ঘরের ব্যবধান, সুতরাং দৃষ্টিরেখা তাহা ভেদ করিয়া চলা নিতান্ত অসম্ভব এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক ঘটনা এবং কূট প্রশ্নে সাক্ষীদিগের বিশৃঙ্খল জবাব দ্বারা ইহাদিগকে অবিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ বর্তমান। এই হতভাগ্যগণ সরল গ্রাম্য লোক, অন্য লোকের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত হইয়া যেরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার ভীষণতা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম এবং কূট পরীক্ষায় গোবরা জেনা বারংবার মিথ্যা-কথা বলিয়াছে ইহা প্রকাশ পায়, অতএব আমরা তাহাকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করিলাম।

আসামীর পূর্ব দুষ্কর্ম প্রমাণ করিবার জন্য পুলিস কয়েকজন সাক্ষীর জবানবন্দি লইয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা আমরা এই প্রমাণ পাইয়াছি যে আসামী কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া অন্য লোকের সম্পত্তি হরণ করার জন্য নিপুণ। কিন্তু কাহারও প্রতি অন্যায় বলপ্রয়োগ করিবার প্রমাণ নাই। সুতরাং এরূপ লোকের দ্বারা নরহত্যা করা অসম্ভব এবং হত্যা করিবার কোনও কারণ দেখি না। মৃত শারিআ বা ভগি চন্দের তাঁতের শানা, মাকু,

তাঁতী, কাঠ, চরকা প্রভৃতি তাঁত বোনার সরঞ্জাম এবং বাসন কোসন আদি গৃহকর্মের দ্রব্য পুলিস আসামীর গৃহ হইতে জব্দ করিয়াছে। কিন্তু আসামী সিভিল কোর্টে যে তালিকা দাখিল করিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে ভগি চন্দ ছয় মাণ আট গুণ্ঠ জমি আসামীর নিকট বন্ধক রাখিয়াছিল। সেই মামলার আদালত খরচা আদায় বাবদ আসামী নিলামসূত্রে সে সকল খরিদ করিয়া লইয়াছে। সেই কবালা নালিশ নিলাম সমস্ত প্রতারণাপূর্ণ করিবার যথেষ্ট কারণ বর্তমান। কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমায় সে সমস্ত বিষয় বিবেচ্য নহে। আসামী ভগি চন্দের ছয় মাণ আট গুণ্ঠ নিষ্কর জমি এবং তাহার সর্বস্ব হরণ করায় ভগি চন্দ সেই দুঃখে পাগল হইয়া গিয়াছে ও শারিআ অনাহারে প্রাণত্যাগ করে এইরূপ আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু সেই জন্য আসামীকে নরহত্যার অপরাধে অপরাধী করা যাইতে পারে না।

আসামীর আঙিনা হইতে নেত নামক এক ধবধবে সাদা রঙের গাই পুলিস জব্দ করিয়াছে। গাই ভগি চন্দর একথা উভয় পক্ষ স্বীকার করিতেছে। আসামী বলে, তাহার মোকদ্দমা খরচ আদায়ের জন্য আদালতের পেয়াদা নিলাম করায় প্রকাশ্য নিলামে সে তাহা খরিদ করিয়াছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অসত্য বটে, কারণ সিভিল কোর্টের দস্তখত মোহরযুক্ত যে নিলামী ফর্দ আমাদিগের সাক্ষাতে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে নেত নামক গাইয়ের উল্লেখ নাই। আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি যে আসামী শঠতা ও প্রতারণা দ্বারা পরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার ব্যাপারে অতিশয় নিপুণ। সে সামান্য লোক ছিল। অসৎ উপায় অবলম্বন দ্বারা অনেক উপার্জন করিয়াছে এবং সে গ্রামের জমিদার এবং ক্ষমতাশালী হওয়ায় ভগি চন্দকে দুর্বল ও প্রতিকার করিতে অক্ষম জ্ঞান করিয়া স্বাভাবিক লোভ রিপু দ্বারা চালিত হইয়া উল্লিখিত গাইটিকে আত্মসাৎ করিয়াছে। এই সকল কারণ দৃষ্টে—

হুকুম হইল যে

আসামী রামচন্দ্র মঙগরাজকে নরহত্যা অপরাধ হইতে মুক্তি দিয়া নেত নামক গাই আত্মসাৎ করিবার অপরাধে কঠিন পরিশ্রম সহ ছয় মাস কারাদণ্ড এবং পাঁচশত টাকা জরিমানা করা যাউক, জরিমানা উসুল না হইলে অতিরিক্ত তিন মাস কারারুদ্ধ রাখা যাউক। ইতি। মে মাস ১৭ তারিখ সন ১৮৩২।

এইচ্ আর জ্যাকসন্
সেশন জজ্।

কাছারি শেষ হইল। জজ্ সাহেবের বগি চলিয়া গিয়াছে। চারিজন বরকন্দাজ একজন আসামীকে হাতকড়ি দিয়া নাজিরখানা হইতে জেলের ওয়ারেণ্ট লইয়া বাহির হইল। উকিল রাম রাম লালা কাছারির সামনে বট গাছের তলায় বসিয়াছিলেন। আসামীর উপর নজর পড়িতে তিনি দূর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখলেন মঙগরাজ মশায়, আজ আপনার জন্য সাহেবের সামনে কি রকম লড়লাম, দেখলেন তো? ফাঁসি থেকে খালাস করে দিলাম। কিছু চিন্তা করবেন না, বেপরোয়া জেলখানায় চলে যান, আপনি এক কলসী পিষতে না পিষতেই সুপ্রীম কোর্টে আপীল করে খালাস করিয়ে দিব।"

আমরা নিশ্চিত সংবাদ পাইয়াছি, আপীলের কোনও চেষ্টা করা হয় নাই।

২২ ॥ গোপী সাহুর দোকান ঘরে

বিরূপা নদীর তীর—গোপালপুর ঘাট। ইহা কটক যাইবার সড়ক, লোকেরা এইখানে পার হয়। আগে গোপালপুর গ্রাম এইখানে ছিল, গত আট অঙ্কের* ভাদ্র অষ্টমীর প্রবল বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। গ্রাম গিয়াছে, নাম যায় নাই। গ্রামের মুড়ায় একটা মস্ত বটগাছ। গাছের তলায় গোপী সাহুর দোকান ঘর। ঘরখানি লম্বায় সাত হাত চওড়ায় পাঁচ হাত। তাহার ভিতরে আধখানা লইয়া একটি বখরা, বাকী অর্ধেক খোলা। সামনে দুই হাত লম্বা দাওয়া। দৈবক্রমে কোনও পথিক রহিয়া গেলে সেই খোলা ঘরে রান্না করিয়া খায়। গোপী বুড়া হইয়াছে, ক্ষেত খামারের কাজ আর পারিয়া উঠে না। গত বৎসর বুড়ার বুড়ী মারা যাওয়া অবধি যেন তাহার মাজা ভাঙিগয়া গিয়াছে। ছেলেরাও বুড়াকে আর কাজ কর্ম করিতে দেয় না। তবে গোপী কেবল বসিয়া থাকিবার পাত্র নহে, এক বৎসর হইল এই দোকান ফাঁদিয়াছে। এক প্রহর বেলা হইলে দুইটা মুখে দিয়া দোকানে আসে, সন্ধ্যায় দোকানঘরে একটি লম্বা নলী তালা দিয়া চলিয়া যায়। দোকান হইতে তার ঘর আধ ক্রোশ। দোকানে চাল, ডাল, নুন, চিড়া, তামাক পাতা রাখে, সন্ধ্যায় ঘরে যাইবার সময়ে সমস্ত পসরা একটা ঝুড়িতে ভরিয়া লইয়া যায়। গোপী গাঁয়ের লোকের কাছে বলে আজকাল তাহার শখের খরচ বড় বাড়িয়াছে, সন্ধ্যাবেলা সরিষা পরিমাণ আফিম না খাইলে রাত্রে ঘুম হয় না। আফিম খাইয়া দুটি চিড়া বা মুড়ি মুখে না ফেলিলে নয়। ধূমপানের অভ্যাস তো আছেই। তবে খরচ নিজের উপায় হইতেই চালায়। ছেলেরা দোকান করিবার জন্য যে আট আনা পয়সা দিয়াছিল তাহা হইতেই যা পয়সাটি আধলাটি আসে তাহাতেই চলিয়া যায়, পুঁজিতে হাত পড়ে না।

আশ্বিন মাসের দিন; সারাদিন মেঘ করিয়া আছে, দুই তিন পসলা জলও হইয়া গিয়াছে। টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়িতেছে, পথ কাঁদায় প্যাচ প্যাচে, পথিক কেউ নাই। বেলা আরও একদণ্ড আছে কিন্তু মেঘ করিয়া থাকায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। গোপী দোকানের দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, আধলাটির তামাক

* অঙ্ক॥ পুরীর রাজার অভিষেক হইতে গণিত অব্দ, কিন্তু এই গণনায় ১, ৬, ১৬, ২০, ২৬, ৩০ ইত্যাদি অঙ্কগুলি ডিঙাইয়া যাওয়া হয়।

পাতাটুকুও কাটলো না!" গোপী পসরা ঝুড়িতে পুরিয়া গামছা মাথায় বাঁধিয়া দাওয়ায় বসিল, আকাশ পানে তাকাইয়া আপন মনে কহিল—বেলা যায় নাই। নদীর ঘাটের দিকে চাহিয়া আছে, যদি কোনও পথিক পার হইয়া আসে। একদৃষ্টে ঘাটের দিকে চাহিয়া ভজন ধরিয়াছে—

দিন গেল যে চলি
বৃথা কাল কাটাইনু না ভজি শ্রীহরি। ধুয়া।
আয়ু যে বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়,
পড়িলে কাল সাগরে আর না আসিবে ফিরি।
বিষয়ে হইয়া মত্ত দিবস শর্বরী
আপন ধাম যে সদা রহিনু পাসরি।
দীনজনে দয়া কর দয়াময় হরি,
নিরন্তর তোমার নাম রব হৃদে ধরি।

"ও দোকানী, থাকবার জায়গা হবে?" গোপী চমকিয়া তাকাইল, দোকানের সামনে দুইজন পথিক ধুতি-চাদর গায়, মাথায় গামছা জড়ানো, পিঠে ছোট একটি বোঁচকা, তালপাতার ছাতা কাঁধে একজন পুরুষ; তার পিছনে একটি স্ত্রীলোক, পাটের শাড়ী পরনে, কুম্ভপাড় সুতী শাড়ি একখানা চার পাট করিয়া গায়ে জড়ানো, সর্বাঙ্গ ঢাকা, কেবল নাকের ফুলগুণা* ও নাটময়ূর† দেখা যাইতেছে। লোকে বলে ভেখ না থাকিলে ভিখ মিলেনা। বেশভূষা দেখিয়াই গোপী বুঝিল জবর মহাজন। গোপী তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে নামিয়া আসিয়া দুইজনকে দুইটা দণ্ডবৎ করিয়া বলিল, "আসিতে আজ্ঞা হোক, উপরে আসুন, রান্না করুন, সব যোগাড় আছে, দেব।" গোপী দুইজনের পায়ের দিকে চেয়ে দুই ঘটি জল দিল ও খোলা ঘরে ছেঁড়া পাটিখানা পাতিয়া দিল। স্ত্রীলোকটি আগে পা ধুইয়া ভিজা কাপড় ছাড়িয়া পাটিতে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিলেন। দেহের অলঙ্কারাদি দেখিয়া গোপী আজ্ঞা, কর্তাবাবু, মাঠাকরুন, ইত্যাদি সম্বোধন করিতে লাগিল। এদিকে স্ত্রীলোকটিও গোপীর ভক্তি দেখিয়া ভারী খুশী হইয়া গিয়াছেন; আঁচলের গেরো খুলিয়া একটি সিকি বাহির করিয়া গোপীর কাছে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "বাছারে, রান্নার যোগাড় দে।" গোপী শশব্যস্তে সিকিটি তুলিয়া লইয়া দুই হাত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দুই তিনবার দেখিল, তারপর দুইবার চুমা খাইয়া দুইবার মাথায় ঠেকাইয়া

* ফুলগুণা॥ ওড়িয়া রমণীর নাকের এক পাশে পরিবার বর্তুলকার, ফুলের নক্সা আঁকা নাকছাবি।

† নাটময়ূর॥ ওড়িয়া নারীর নৃত্যরত ময়ূরের আকৃতিবিশিষ্ট নাকছাবি।

কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া নাভির কাছে গুঁজিয়া রাখিল। গোপীর মুখ দেখিলে বোঝা যায়, সে এখন আবার মনে মনে বলিতেছে, "আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, সওদা না নিতেই গোটা একটি সিকি!" দোকানের পত্তন হওয়া অবধি ইহা নূতন ব্যাপার। গোপী রান্নার যোগাড় অর্থাৎ চাল, খোসাশুদ্ধ কলায়ের ডাল ও নুন আনিয়া রাখিয়া দিয়া উনানে আগুন দিয়া ফুঁ দিয়া ধরাইল। স্ত্রীলোকটি ভাত রাঁধিতে ও পুরুষটি বাঁ হাতে কলসী নিয়া জল আনিতে সচেষ্ট হইলেন। স্ত্রীলোকটি বলিলেন, "অ আমার বাপধন, এখানে দুধ ঘি পাওয়া যায়? দুধ ঘি ছাড়া আমি খাই না।" গোপী বলিল, "আজ্ঞা, যা বলছেন, পাওয়া যায় না তাই না, নইলে এই সব কি রাজাবাবুর আহারের জিনিস? জল খাবার জন্য ভাল কাঁড়া সরু চিড়া হত, খাঁটি গরুর দুধ হত, কন্দ না হয়ে অন্ততঃ দক্ষিণী নূতন গুড় হত। রান্নাশালের জন্য বড় শোল মাছ না হোক বোয়াল মাছ, কাঁচকলা, কাঁচা মুগের ডাল, দুধ, ঘি হত। কি করব? আজ্ঞা, এটা তো কাঙ্গাল দেশ, কপালগুণে আপনাদের পদার-বিন্দধূলিরজ কি করে এখানে পড়ল। আজ্ঞা, গোটা কয়েক পয়সা দিন, গাঁ ঘুরে দেখি।" স্ত্রীলোকটি পুনর্বার একটা সিকি ফেলিয়া দিলেন। গোপী পূর্বের ন্যায় কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া গ্রামে ছুটিল। সন্ধ্যা রাত্রে গোপীর ছোট ছেলে বৃন্দাবন একখানা কলাপাতার ঠোঙ্গায় দুই তিন তোলা ঘি, মাটির কেঁড়েতে এক মাণ* আন্দাজ দুধ, দুইটা বেগুন দোকানের দাওয়ায় রাখিয়া দিয়া বলিল, "আজ্ঞে, বাবা পাঠিয়ে দিলেন, উনি রাতকানা, আসতে পারলেন না।"

দোকানে তৃতীয় লোক নাই, স্ত্রীলোকটি ভাত রাঁধিতেছে, পুরুষটি যোগান দিতেছে, দুজনে কথাবার্তা আরম্ভ করিল।

স্ত্রী—শুনলি তো গোবিন্দা, শুনলি তো, কান দিয়ে শুনলি? আমায় সকলে ঠাকরুন বলছে, যেখানে যাব সকলে ঠাকরুন বলবে, তোকে কর্তা-বাবু কে বলবে? চল্, কটকে চল্, তোকে কি করে দিই দেখিস্, তোকে চার দিন হল বুঝিয়ে বুঝিয়ে হার মানলাম।

গোবিন্দা—না চম্পা ঠাকরুন, চল আমাদের গাঁয়ে যাই, সেখানে থাকব। জমিজমা কিনব, চাষ করব, মজুর রাখব।

চম্পা—আরে, দেখছি বাস্তবিকই লোকে যে বলে :

'অতি হীন আঁধার রাতি,
অতি হীন নাপিত জাতি।'†

* মাণ॥ মাপ বিশেষ।
† ওড়িয়া প্রবাদ।

জমিজমা কি হবে রে? আরে যা সঙ্গে এনেছি শ দুশ বছর বসে খেলেও যে ফুরোবে না।

গোবিন্দা—না, তা হবে না, আমি দেশে যাব, বাড়ি থেকে অনেক দিন হল কোন খবর পাই নাই, আমার মনটা কেমন আনচান করছে। নয় তো আমার ভাগ আমায় দাও, আমি যাই, তোমার যা ইচ্ছা কর।

চম্পা—ভাগ? ভাগ কিরে? ভাইয়ের ভাগ? আরে, কথায় বলে

'পড়শির পিঠে দেখে প্রাণ হাঁই পাঁই
ঘুঁটে গুড়ে এক করে' দাঁতে কেটে খাই।'*

ধন সেখানেও ছিল আমার, এখানেও আমার, আমি কি চুরি করে এনেছি? সাত দিন হল রোদ নাই বৃষ্টি নাই এ গাঁ সে গাঁ, এর ছাঁচতলা তার ছাঁচ-তলা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারলি। বল্ দেখি, রাজাবাবুর শোবার ঘরের কোণে তিন জায়গায় সোনার টাকা, কলের টাকা, সোনার গহনা সব যে পোঁতা হয়েছিল, কে পুতেছিল? নিশুতি রাতে আমি গর্ত খুঁড়ি, কর্তা-বাবু আর আমি দুইজনে পুঁতি। তুই কি জানতিস্? এ সব আমার না আর কারও?

গোবিন্দা—টাকা তো পুঁতেছিলে, সব করেছিলে, চাবি না পেলে কিছু পেতে কি? চাবি আনবার বুদ্ধি কে দিল?

চম্পা—'এতেই এত—না, আঙগট নাই পা দাপাস্ কত।'* ভারী বুদ্ধি দিয়েছিলি! আমার মাথায় যেন আর আসত না। দেখলিত, সেদিন কর্তাবাবুর পিছু পিছু গরম বালির ওপর দুই কোশ পথ ছুটতে ছুটতে পায়ে ফোসকা পড়ে গেল, কেঁদে কেঁদে গলা বসে গেল, বলে কি না বুদ্ধি দিয়ে দিলাম। 'বুদ্ধি রে বুদ্ধি—না, টক্কর দিই চক্ষুমুদি'‡। আচ্ছা, বল্ তো, আমি যে সেই বিধবা বামনীর সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে এক রাত থেকে তার ঘর হতে জমির সনন্দ পেটরার ভিতর হতে নিয়ে আসলাম, সে বুদ্ধি তুই দিয়ে দিয়েছিলি?

গোবিন্দা আর কিছু না বলিয়া রাগ করিয়া আসিয়া দাওয়ায় বসিল। চম্পাও চুপ। এক পাঠশালায় পড়া, এক গুরুর পড়ুয়া, সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি, কেহ কাহারও চাইতে কম নহে, সহজে কে হটিবে? দুই-জনে দুইজনকে চিনে। চম্পার ভাবনা, যদি গোবিন্দা দেশে যায়, টাকা সোনা সব তাহার হাত হইতে গিয়া নাপিতের ঘরে ঢোকে, আবার হাত ঘুরিয়া আসা সহজ নহে। আবার গোবিন্দার মা আর স্ত্রীর কথাও তাহার মনে হইল। এদিকে গোবিন্দার ভাবনা, চম্পা একবার কটকে গিয়া

*†‡ওড়িয়া প্রবাদ।

পাড়িতে পারিলে তাহাকে আয়ত্তে রাখা সহজ হইবে না। এ'টোখাকী কুকুরী আর একটি এ'টো পাত দেখিলে আগের পাতটি পায়ে মাড়াইয়া যায়। বিপরীত মুখী দুই বল সমান হইলে উভয়ে স্ব স্ব স্থানে স্থির হইয়া থাকে।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে, ভাত, ডাল রান্না হইয়া গিয়াছে। চম্পা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, কাছে আসিয়া খুব নরম সুরে বলিল, "দেখ্ গোবিন্দা, তুই তো বলছিস নদীর ওপারে চার কোশ দূরে তোর বাড়ি। ভাল, তুই চল্, কটকে চল্, আমি কিছু টাকা দেব তুই বাড়িতে দিয়ে যাস্। তুই যদি আমার কথা না শুনিস্, টাকা তো টাকা, সোনা তো সোনা, কানাকড়ি ধোয়া জলও এক ফোঁটা যদি পাস্! আয় আয়, বড় ক্ষিদে লেগেছে খাই আয়।" গোবিন্দাও ক্ষুধায় কাতর, বোধ হয় সে এতে নিমরাজি হইয়া উঠি উঠি করিতেছিল, কিন্তু অন্ধকারে চম্পা তো দেখিতে পাইতেছে না, কোনও জবাব না পাইয়া রাগিয়া গিয়া বলিল, "ম'ল যা, চাকরকে বাবু বললে মাথায় চড়ে।'* তা তুই খাবি তো খা, না খাবি তো নাই।" গোবিন্দা উঠিতেছিল, আবার বসিয়া পড়িয়া চম্পার দিকে কটমট করিয়া চাহিল। মনে ভাবিল, হাঁ, আমি চাকর, তুই ঠাকরুণ। কিন্তু মুখে কিছু বলিল না। গোবিন্দা কত সৌভাগ্যের স্বপ্ন দেখিতে-ছিল, কত জমিজমা, কত বলদ, কত মজুর, কত দুধেল গাই ঘরে বাঁধা, কত খাতক টাকা কর্জ করিতে আসিয়া দুয়ারে বসিয়া আছে। সব কিছুতেই একেবারে নিরাশ। সারাদিন জলে কাদায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত, তার উপরে ক্ষুধা। গোবিন্দা এতক্ষণ মনের দুঃখে বসিয়া ভাবিতে-ছিল। এমন সময়ে চম্পা চাকর বলাতে ব্রহ্মতালুতে যেন বিছা কামড়ানোর মত সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়া গেল। কিছু বলিতে পারে না। সে জানে তার মত দুইজন চম্পার সহিত গায়ের জোরে পারিবে না। সে কতবার চম্পাকে মঙ্গরাজের জোয়ান মজুরদের মারিতে নিজের চোখে দেখিয়াছে। তাহার অন্তর তুষের আগুনে পুড়িতে লাগিল।

চম্পা দুই পাতে ভাত বাড়িয়া ভাতের মাঝখানে গর্ত করিয়া ডাল ঢালিয়া দিল, বৃন্দাবন যে দুধ দিয়া গিয়াছিল সে সবটা বাহিরের দিকে একবার তাকাইয়া নিজের ভাতে ঢালিয়া দিল। গোবিন্দা অন্ধকারে বসিয়া দেখিতেছে। দুধ ঢালা দেখিয়া তার সারা শরীরে কে যেন আগুন ঢালিয়া দিল। মনে মনে ভাবিল, এইটুকু দুধেই তো এই, টাকা ও সোনার কথা ছাড়িয়া দাও।

* ওড়িয়া প্রবাদ।

চম্পা ডাকিয়া কহিল, "এই তোর ভাত রইল, খা আর নাই খা, আমি এত তোর পায়ে ধরতে পারি না।" চম্পা ভিজা হাতটা মুখে বুলাইয়া উবু হইয়া পাতের কাছে বসিয়া বড় বড় গ্রাসে হাপুস হুপুস শব্দে এক দণ্ডের মধ্যে পাত খালি করিয়া ফেলিল। উনানের কাছে মুখটা ধুইয়া ফেলিয়া আর একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া ডাকিল, "আরে আয়, ভাত খা।" উত্তর নাই। রাগিয়া গিয়া বলিল, আরে একেই বলে সুখের ভাতে গলা চুলকানো।"* গোবিন্দার মনে হইল যেন জ্বলন্ত আগুনে কুটা ফেলা হইল। তারপর চম্পা পাটির উপরে গাঁট বাঁধা কাপড়ের কতক বিছাইয়া দিয়া গাঁটটি সাবধানে ঘাড়ের তলা পর্যন্ত দিয়া চিত হইয়া শুইয়া পড়িল। গোবিন্দা তেমনি দাওয়ায় বসিয়া ভাবিতেছে। সে এখন ভাল করিয়া বুঝিয়াছে যে সাপিনীর মাথার মণি নেওয়া সহজ নহে। আমরা গোবিন্দপুরের লোকের কাছে যেরূপ শুনিয়াছি তাহাতে অনুমান করি গোবিন্দার আরও অধিক কিছু প্রত্যাশা ছিল। স্ত্রীলোকের নিকট মর্যাদা প্রেম ভক্তি আনুগত্য প্রত্যাশা করা পুরুষের স্বভাব। চম্পার আচরণে মনে হয় তাহার ভাবখানা এই ভালবাসি তো ভালবাসি কিন্তু তুই যে নাপিত সেই নাপিত। গোবিন্দা এই ভাবে কতক্ষণ বসিয়া রহিল সে জানে না। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, নিজের হাত দেখা যায় না। সোঁ সোঁ করিয়া দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে, কিছুক্ষণ অন্তরই এক এক পসলা করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, বট গাছটা একটা অন্ধকারের স্তূপের মত দাঁড়াইয়া দুলিয়া দুলিয়া একটা কেমন আতঙ্কজনক শব্দ করিতেছে। কতকগুলা বাদুড় ছোট ছোট অন্ধকারের টুকরার মত চারিদিক হইতে উড়িয়া সেই অন্ধকারের স্তূপে আসিয়া মিশিয়া যাইতেছে, আবার টুকরা টুকরা অন্ধকারের মত বাহির হইয়া আকাশে উড়িয়া যাইতেছে, কিচ্ কিচ্ শব্দ করিয়া বটফল খাইতেছে, টপ্ টপ্ করিয়া বটফল নিচে পড়িতেছে। চতুর্দিকে পৈশাচিক শব্দ, ঘরের মধ্যে চম্পার আনুনাসিক শব্দ আরও ভয়ঙ্কর শুনাইতেছে। সেই রাশীকৃত অন্ধকারের তলায় দুইটা পশুর খ্যাঁক খ্যাঁক কামড়া কামড়ির শব্দ শুনিয়া গোবিন্দা চমকিয়া চাহিল। ঘরের ভিতরকার প্রদীপের শিখাটি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যার অন্তিম লোহিত কিরণরেখাটি অনন্ত আকাশে যেমন করিয়া পড়ে ঘরের ভিতরকার প্রদীপের একটি রশ্মি তেমনি নিস্তেজভাবে সেই অন্ধকারে আসিয়া পড়িয়াছে। গোবিন্দা ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল দুইটা শিয়াল বটফল খাইতে খাইতে ঝগড়া করিতেছে, একটা শিয়াল অন্যটাকে তাড়াইয়া

*বাঙলা প্রবাদ—সুখের ভাত ভূতে খায়।

দিয়া আপনি সমস্ত ফল অধিকার করিল। গোবিন্দা শিয়ালের কার্য-কলাপ দেখিয়া কি বুঝিল, মনে মনে কি ভাবিল উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে সাবধানে তাকাইল, ধীরে, অতি ধীরে উঠিয়া গিয়া চম্পার পা হইতে মাথা পর্যন্ত দেখিল। কুলুঙ্গিতে কামাইবার থলি রাখিয়াছিল, আস্তে আস্তে আনিয়া তাহা হইতে কি বাহির করিয়া কাপড়টা কোমরে ভাল করিয়া জড়াইয়া সেই পদার্থটা শক্ত করিয়া ধরিল, ধীরে গিয়া চম্পাকে একদৃষ্টে দেখিল। ভূমিশায়িতা নিদ্রিতা শূকরীর দিকে বনের ভিতর হইতে কেঁদো বাঘ যেমন করিয়া তাকায় তেমনি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, তাহার চোখ দুইটা জ্বলিতেছে, ডান হাতে শক্ত করিয়া কি ধরিয়া আছে, এত সাবধান এত ধীর যে নিশ্বাসটাও জোরে ফেলিতেছে না। ডান পা আগাইবা মাত্র একটা জ্যোতি চক চক করিয়া উঠিয়া চম্পার উপর দিয়া দেওয়ালের গায়ে পড়িয়া মিলাইয়া গেল। গোবিন্দা চমকিয়া উঠিয়া একেবারে দাওয়ার নিচে নামিয়া পড়িল। চারিদিকে সাবধানে তাকাইল, কোথাও কিছু নাই কেবল পূর্বের মত চতুর্দিকে ঘোর পৈশাচিক শব্দ, গাছের নিচে ডালের কয়েক টুকরা অন্ধকার ঝট পট করিয়া উঠিয়া পলাইল, শিয়ালটা চরিতে-ছিল পলাইয়া গেল, তাহার হাতের পদার্থ বিশেষে আলো পড়িয়া চক চক করিয়া উঠিল, গোবিন্দা সব বুঝিতে পারিল। আগের চাইতেও বেশী সাহসে ভর করিয়া আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া ঘরের ভিতরে গেল। শূকরীর উপর কেঁদো বাঘ যেমন করিয়া লাফ দিয়া পড়ে তেমনি চম্পার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ঠিক সেই সময়ে প্রদীপের সলিতা ফুরাইয়া যাওয়াতে একবার দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া নিবিয়া গিয়া সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেল। ঘরের মধ্যে উৎকট গোঁ গোঁ শব্দ, হাত পা ছুড়ি-বার শব্দ শুনা গেল তারপর সমস্ত নিস্তব্ধ হইল। সেই শব্দ শুনিয়া শিয়াল ছুটিয়া পলাইল। গাছ হইতে টুকরা টুকরা অন্ধকার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ার মত বাদুড়গুলা কর্কশ শব্দ করিয়া উড়িতে লাগিল। এই সময়ে একটা প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু আসিয়া গাছের ডালগুলিকে দোকান ঘর-খানিকে মড় মড করিয়া দোলাইয়া দিয়া গেল। মুহূর্তের জন্য সেখানে নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে মনে হইল।

২৩ ॥ কর্মফল

গোপালপুরের কাছে বিরূপা নদী খুব চওড়া, আধক্রোশের কম নহে। কিন্তু ধারাটি তত চওড়া নহে, দহের মত জায়গা কম চওড়া হয়। ধারাটি নদীর দক্ষিণ তীর ঘেঁসিয়া, গোপালপুর ঘাটে কেবলই বালি। প্রবল বান আসিলে ঘাট পর্যন্ত জল আসে। দশ বারো দিন হইল তেমন বৃষ্টি না হওয়ায় নদীর জল নামিয়া গিয়াছিল, পরশু দিন বিকাল হইতে আবার অল্প অল্প জল আসিতেছে, পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনা সারি সারি ভাসিয়া যাইতেছে। কোনও কোনও স্থানে চালকুমড়ার মত বড় এক একখানি ফেনা ঘূর্ণিতে পড়িয়া ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইতেছে। কাঠ-কুটা কত ভাসিয়া যাইতেছে ঠিকানা নাই। জায়গাটাতে দহ থাকায় এখানে মানুষ-খেকো কুমীরের বড় উপদ্রব, মেছো কুমীর ও ঘড়িয়াল তো শত শত। এখানে ভরসা করিয়া কেহ হাঁটু জলের বেশী জলে যাইতে পারে না। আবার নূতন জল আসিলে কুমীরগুলো ভারী উৎপাত শুরু করিয়া দেয়। নূতন বানকে বিশ্বাস নাই, কুমীর ফেনা হইতে খাবার খুঁজিয়া খায়। ঘাটে দিনরাত একখানি নৌকা বাঁধা থাকে, গাঁয়ের লোক হাটুরে লোক পার হয়। সরকারী ডাক পার করিবার জন্য মাঝি দিনরাত তাহার পাতার কুঁড়ের ভিতর বসিয়া থাকে, সরকার হইতে মাসে দুই টাকা মাহিনা পায়। গাঁয়ের লোক নগদ কিছু দেয় না, পৌষ মাসে ধান কাটার সময় মাঝি এ ক্ষেত ও ক্ষেত ঘুরিয়া ঘর প্রতি এক এক আঁটি করিয়া উসুল করে। হাটবারে হাটুরেরা কেহ চারিটা তেত শুঁটকি মাছ, কেহ দুইটা বেগুন, কেহ এক চিমটি নুন, কেহ দু ফোঁটা তেল দিয় যায়। কোনও কোনও দিন বড় বড় মহাজন, অচেনা পথিক আসিলে পয়সাটা আধলাটা জলপানি দিয়া যায়। দেশ কাল পাত্র অনুসারে এই লাভে কম বেশি হয়, কিন্তু সরকারী লোক অর্থাৎ থানার দারোগা, মুনশী, কানুন-গোই পার হওয়ার দিন কানমলাটা, চড়টা, গালিটা কখনও বাদ যায় না। চান্দিআ বেহেরা জেলে বলে, এই ঘাট পার করিয়া তার সারা জীবন গেল। তাহার ন্যায় জবর মাঝি এ তল্লাটে দেখা যায় না।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। রাত্রে প্রবল বৃষ্টি প্রচণ্ড তুফান হইয়া-ছিল, এখন জল বা বাতাস নাই, আকাশে তেমনি মেঘ করিয়া আছে, অকারণে কোথাও কেমন করিয়া কোনও ফাঁকে কয়েকটি তারা জ্বল জ্বল

করিয়া চাহিয়া লুকাইয়া পড়িতেছে। ঠিক এই সময় একজন পথিক ছোট একটি বোঁচকা পিঠে করিয়া ঘাটের কাছে নদীর ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, নদীর বাঁধ ধরিয়া চার পাঁচ শ হাত চলিয়া গিয়া আবার ঘাটে ফিরিয়া আসিতেছে। মনে হয় সাঁতরাইয়া নদী পার হইবার ইচ্ছা, কিন্তু তত বল পাইতেছে না। ঘাটে দাঁড়াইয়া ডাকিল—ও মাঝি ভাই, ও মাঝি ভাই। চান্দিআ বেহেরা বালিতে লগিটা পুঁতিয়া দিয়া একখানি লম্বা দড়িতে নৌকাটা বাঁধিয়া ঘাটের কাছে তাহার কুঁড়ের ভিতর শুইয়া আছে। পথিক আর একবার অতি সাবধানে ডাকিল—ও মাঝি ভাই, মাঝি ভাই। পথিক ডাকিয়া যেন হঠাৎ চমকিয়া পিছনে চাহিল। মাঝি কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে? এত ডাকাডাকির জবাব নাই কেন? কিন্তু আমরা নিশ্চয় জানি মাঝি রাত থাকিতেই উঠিয়া বসিয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করিবে। শাস্ত্রবিধি পালন করিবার জন্য যে চান্দিআ উঠে তাহা নহে। এক-একদিন রাত্রির শেষ প্রহরে ডাক আসিয়া পড়ে সেইজন্য সে সজাগ থাকে। আর-একটি কথা, সন্ধ্যাবেলা ঘাট বন্ধ হইয়া যায়, সকাল সকাল দুইটা খাইয়া শুইয়া পড়ে। সারারাত কত আর ঘুমাইবে? চান্দিআ কুঁড়ের ভিতর দুই হাঁটুর উপরে মাথা রাখিয়া উবু হইয়া বসিয়া আছে, সামনে আগুনের সরা, তুষের আগুনের উপর দুটি হাত বাড়াইয়া দিয়াছে। বোধ হয় মনে মনে ভাবিতেছে অবেলায় কে ডাকে! সরকারী লোক ত নিশ্চয় নহে; এ লোকটা ভাই ভাই ডাকিতেছে, সরকারী লোক হইলে শ্বশুরকুলের সম্পর্ক ধরিয়া ডাকিত। যেই হোক, ডাকিতে থাক, রাত পোহাক দেখিব। পুনরায় ডাক—ও মাঝি ভাই, আয় বাইরে আয়, জলপানি দেব। চান্দিআ আর সামলাইতে পারিল না, জলপানির নাম শুনিয়া দুই তিন বার কাশিল। জলপানি শব্দটাতে কিরূপ একটা মোহিনী শক্তি আছে। মাঝি তো মাঝি, জলপানি শব্দ শুনিলে কত বড় বড় লোকও কাশিয়া ফেলেন। চান্দিআ ভিতর হইতে জবাব দিল, কে ডাকে? সবুর কর রাত পোহাক, লক্ষ টাকা দিলেও তো আমি এখন বাহির হইব না।

পথিক—দেখ ভাই মাঝি, আমার কটকে মোকদ্দমা আছে, তাড়াতাড়ি যাব, নাও পাঁচ টাকা নাও।

পাঁচ টাকা! এ কি এ? এক পারনিতে পাঁচ টাকা? চান্দিআর জীবনে কখনও এরূপ ঘটনা ঘটে নাই। এক সঙ্গে পাঁচ টাকা তার হাতে পড়িয়াছে কিনা সে বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। সে পূর্ব মুহূর্তেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল লক্ষ টাকা পাইলেও বাহির হইবে না, এক

লক্ষ হইতে পাঁচ বাদ দিলে বাকি কত কম হইল এ কথা আলোচনা করা বোধহয় অনাবশ্যক বোধ করিল। এদিকে ভয়, পথিক যদি ফিরিয়া যায়, নয় তো রাত পোহাইয়া গেলে একটা পয়সা না হয় তো দুইটা। চান্দিআ কুঁড়ের ভিতর হইতে হাঁক দিল, "দাঁড়াও, তবে দাঁড়াও, আমি যাই।" আগুনের উপর ফুঁকিয়া ফুঁকিয়া একটা মোটা বিড়ি ধরাইয়া হাতে বৈঠাটি লইয়া কুঁড়ে হইতে বাহির হইয়া পড়িল, পরনের কাপড়টা কোমরে কষিয়া দিয়া মাথায় গামছা একখানা জড়াইয়া মাথালিটা রাখিয়া দিল। পথিককে বলিল, "দাও, দাও কি দিচ্ছ, তুমি বলে আমি বাসা ছেড়ে বার হলাম, আর কেউ হলে কি আমি উঠতাম?" পথিক পাঁচটি টাকা বাড়াইয়া দিল। মাঝি দুই হাতে এক দুই তিন চার পাঁচ, এহাত ওহাত করিয়া তিন বার গনিল। 'কড়ি নেবে দেখে, জল খাবে ছেঁকে।' বিড়িতে জোরে একটা টান দিয়া তাহার ক্ষীণ আলোকে একবার টাকাগুলি দেখিয়া লইল। কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া কোমরে ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া একবার আকাশের দিকে আর একবার চারিদিকে তাকাইল, আর রাত নাই। পথিক নৌকার আগা-গলুইয়ে গিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। মাঝি ডাকিয়া বলিল, ভাল করিয়া সামলাইয়া বস। ডান হাত তিন বার নৌকায় ছোঁয়াইয়া মাথায় ঠেকাইয়া নৌকা খুলিয়া দিল, 'জয় গঙ্গা মাতা' বলিয়া নৌকায় উঠিয়া বসিল। বর্ষার বানের তোড় পড়িয়াছে, সামলানো যায় না, বৈঠা বাহিতে বাহিতে নৌকা বহুদূর ভাটিতে ভাসিয়া গেল। সামলাইয়া তুলিতে তুলিতে নদী ছয় আনা ভরিয়া গিয়াছে, রাত প্রায় পোহাইয়া আসিয়াছে, গোপালপুর ঘাটের নিকট হইতে একটা গানের সুর ভাসিয়া আসিল—

এ-এ-এ-এ রাম আর লক্‌খন গেলেন মৃগ মারিবারে
সন্ন্যাসী আসিয়া উঠে সীতার দুয়ারে।
বলে গো সীতা ভিক্ষা দাও গো আমারে
নইলে অভিশাপ দিব রাম লক্‌খনেরে।

পথিক নৌকায় বসিয়া বারংবার গোপালপুর ঘাটের দিকে চাহিতেছে। গানের আওয়াজ অবিরত অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া কানে আসাতে পথিক চঞ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া সেই দিকে চাহিল। মাঝির কানে আওয়াজ যায় নাই, এক মনে নৌকা বাহিতেছিল। নৌকা টলমল করায় ডাকিয়া বলিল—"আরে বসে পড়, বসে পড়।" পথিকের ভাব দেখিয়া মাঝিও ঘাটের দিকে চাহিল। বলিল, "ও হো হরকরা এসে গেল যে।" এই বলিয়া নৌকার মুখ ঘুরাইয়া দিল। পথিক ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, "ও মাঝি ভাই, নৌকা ফিরিও না, আমায় আগে পার করে

দাও।" মাঝি বলিল, "আরে ম'ল, সরকারী কাজ—আমি কি জেল যাব?" রাত্রি শেষ, অল্প অল্প আলো হইয়াছে, মাঝি দেখিল পথিকের সর্বাঙ্গ রক্তময়। কাপড়ে রক্ত, হাতে রক্ত, বোঁচকায় রক্ত। দোলে ফাগ খেলার মত লাল টকটকে দেখাইতেছে। মাঝি চমকিয়া বলিল, "এ কি হে, রক্ত কোথা থেকে এল? তুমি কি কাউকে খুন করেছো?" পথিক তাড়াতাড়ি বোঁচকাটি লইয়া মাঝি হাঁ হাঁ বলিতে বলিতে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পনের কুড়ি হাত সাঁতরাইয়া যাইতেই কোথা হইতে এক মানুষ-খেকো কুমীর আসিয়া টপ করিয়া ধরিয়া ফেলিল। বোঁচকাটি অল্পদূর ভাসিয়া গিয়া ডুবিয়া গেল। চান্দিআ চাহিয়া রহিয়াছে। এ লোকটা কে, কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইতেছিল? বুঝিলেন পাঠক মহাশয়, আমরা হইলাম গ্রন্থকার, সুতরাং সর্বজ্ঞ। এই যে কুমীর লোকটাকে লইয়া গেল, কি জন্য লইয়া গেল, কোথায় লইয়া গেল, তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিল কি অসদ্ব্যবহার করিল এ সকল গুপ্ত বিষয় আমাদের ভাল জানা আছে। কিন্তু চান্দিআ বেহেরা কোনও কারণে এ কথা অনেকদিন পর্যন্ত লুকাইয়া রাখাতে আমরা প্রকাশ করিতে নারাজ। লোকটা নৌকা হইতে জলে লাফাইয়া পড়িবার সময় তাহার বোঁচকা হইতে এক গোছা তালপাতা নৌকায় পড়িয়া গিয়াছিল, সেটা চান্দিআ তাহার কুঁড়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। কিছুদিন পরে পারের যাত্রী একজন পাঠশালার পণ্ডিতকে দিয়া পড়াইতে তিনি একখানা তালপাতা এই রূপ পড়িলেনঃ—

> লিখিতং শ্রীশ্রীমুকুন্দদেবের সাত অঙ্ক* কুম্ভমাস কৃষ্ণপক্ষ দ্বিতীয়া বেলা পাঁচ দণ্ড সময়ে গোবিন্দপুরের জমিদার রামচন্দ্র মঙ্গরাজ মহাজনের সুসাক্ষাতে এই গ্রামের অধিবাসী তেলীপুত্র শাম সাহুর তমসুক। এই কারণ তমসুক লিখিয়া দিলাম যে আমার পুত্র ভীমার বিবাহে আপনার নিকট দশ টাকা কার্জ লইলাম, আগামী ধনু মাসে আমার গোলা হইতে আপনার খামারে গউনীতে† চলিত দর প্রমাণে ধান মাপিয়া নিয়া তার সুদ বাবদে অর্ধেক কি মূল এক নউতিতে আট বিশ্বা পরিমাণে মাপিয়া লইবেন। অত্র প্রমাণ, ইহার সাক্ষী চন্দ্রসূর্য দশদিক্‌পাল।

চান্দিআ বেহেরা নৌকা বাহিবার সময় তেরোদিন পর্যন্ত ঠিক সেই স্থানটিতে জলের দিকে একবার করিয়া তাকাইত।

* অঙ্ক॥ পুরীর রাজার অভিষেক হইতে গণিত অব্দ, কিন্তু এই গণনায় ১, ৬, ১৬, ২০, ২৬, ৩০ ইত্যাদিতে অঙ্কগুলি ডিঙাইয়া যাওয়া হয়।
† গউনী॥ ধান মাপিবার পাত্র।

২৪ ॥ খুনের তদন্ত

বেলা আন্দাজ দুই প্রহর হইবে। আজ বৃষ্টি নাই, গোপী সাহু দোকানী ছেঁড়া বহুগ্রন্থিযুক্ত কালো নেকড়ার ন্যায় একখানি গামছা মাথায় ফেলিয়া দোকানের ঝুড়ি কাঁধে হাতে চাবি কাঠি লইয়া দোকানে আসিল। দোকান খুলিয়া খোলা ঘরের দিকে তাকাইল। যাহা দেখিল তাহাতে সে ঝিম মারিয়া গেল, কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, মুখে কথা সরে না। কথা নাই বার্তা নাই একটি স্ত্রীলোক চালের দিকে তাকাইয়া মরিয়া পড়িয়া আছে। সারা ঘর রক্তে ভাসিতেছে, শাল পাতায় রক্ত, উনানের মুখে রক্ত, ভাতের হাঁড়িতে রক্ত, রক্ত পিচকারি দিয়া দেওয়ালে যেন আলপনা দিয়াছে। গোপী দৌড়াইয়া গিয়া গ্রামে খবর দিল। গ্রামের লোক দেখিতে ছুটিল। গাঁয়ের চৌকিদার সান্তআ জেনা ফাঁড়িতে এতেলা দিতে ছুটিল। মকরামপুরে বালা-গস্তি ফাঁড়ি গোপালপুর হইতে দেড় ক্রোশ দূর। বেলা তিন প্রহরের সময়ে বালাগস্তির জমাদার শেখ তোরাবআলি ও বরকন্দাজ পিতু খাঁ ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শেখ তোরাবআলি একজন ডাকসাইটে পুলিসের হাকিম। আশেপাশের চারি ক্রোশের মধ্যে তাঁর নামে লোকে ভয়ে কাঁপে, গর্ভিনী গাই পথ ছাড়িয়া দেয়। জমাদার সাহেব সরজমিনে উপস্থিত হইয়া দাড়ি ও নাক ঢাকিয়া লাস ময়না করিতে গেলেন। লাস একটি স্ত্রীলোকের, পরনে পাটের শাড়ি, হাতে ও গলায় রূপা ও সোনার কতকগুলি গহনা। মুসলমানে মুরগী জবাই করিবার মত তাহার গলাটি কাটা, কাছে একখানি রক্তমাখা ক্ষুর পড়িয়া রহিয়াছে, লাসটা কিছু পচিয়া উঠিয়াছে, মৌচাকে যেমন করিয়া মৌমাছি বসিয়া থাকে তেমনি কাটা জায়গায় অসংখ্য মাছি বসিয়াছে এবং সারা ঘরে ভন ভন করিয়া উড়িতেছে। লাসটা চারি আঙগুল জিভ বাহির করিয়া কামড়াইয়া দাঁত বাহির করিয়া রহিয়াছে, ঘরের চালের দিকে দুই চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে, চুল খোলা, রক্তে মাখামাখি, দুই দিকে চারি আঙগুল পুরু হইয়া রক্ত জমিয়া কালো হইয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে একটা উৎকট দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। গাল দুইটা চালতার মতো ও পেটটি ধামার মতো ফুলিয়া উঠিয়াছে। দেখা গেল কোনও লোক তাহার চুলগুলিকে এক হাতে ধরিয়া, এক হাঁটুতে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া ক্ষুর দিয়া তাহার গলা কাটিয়াছে। কাটিবার সময় স্ত্রীলোকটা পা ছোঁড়ায় ঘরের মাটীর মেঝেতে গর্ত হইয়া

গিয়াছে। দুর্গন্ধ ও ভয়ঙ্কর মূর্তির জন্য জমাদার বেশীক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। বাহিরে আসিয়া আপন বুদ্ধিবলে ঠিক করিলেন যে ইহা খুনী মামলা, লেকিন্ ডাকাতি নহে। অগর্ ডাকাতি হইয়া থাকিলে ইহার গায়ে গহনা থাকিত না। জমাদারের হুকুমে দুইজন হাড়ি লাসের পায়ে দড়ি বাঁধিয়া হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে আনিয়া নদীর পাড়ে ফেলিল। টানিয়া আনিবার সময় তাহার পাটের শাড়িখানা খুলিয়া নেওয়ায় উলঙ্গ শব আরও ভয়ঙ্কর দেখিতে হইল। সরকারে পাঠাইবার জন্য লাস হইতে গহনাগুলি খুলাইয়া জমাদার থলিতে রাখিলেন, কেবল পায়ের কাঁসার মল কিছুতেই না খোলায় মেথরেরা লাসের দুই পায়ের গোছ কুড়াল দিয়া কাটিয়া মল খুলিয়া নিয়া গেল।

তার পরদিন প্রাতঃকালে মামলার তদন্ত আরম্ভ হইল, বরকন্দাজ ও চৌকিদাররা গিয়া আসপাশের পাঁচখানা গ্রাম হইতে আসামী গ্রেফতার করিয়া আনিল। জমাদার সাহেব বট গাছের তলায় বসিয়া মামলার তদন্ত করিতেছেন, তিন চার শ আসামী ধরিয়া আনা হইয়াছে, তবে সকলে জমায়ত হইয়া নাই, তদন্তের পর বেকসুর খালাস হইয়া যাইতেছে। আসামী ধৃত হইয়া আসিলে তাহাকে লাসের কাছে বসাইয়া রাখা হইতেছে, লাসটা ফুলিয়া চারিগুণ মোটা হইয়াছে, জিভটা একটা ছোট মোচার ন্যায় দেখাইতেছে, দুর্গন্ধের কথা ছাড়িয়া দিন। উলঙ্গ স্ত্রীমূর্তি তো বটে, ইহার পায়ের পাতা নাই, এ হাঁটিতেছিল কি করিয়া? এটা কি রাক্ষসী? আসামীদের বেশীক্ষণ লাসের নিকটে বসিবার উপায় নাই, দুর্গন্ধ ও ত্রাসে শীঘ্র জমাদারের কাছে গিয়া হাজির হইতে হইতেছে। বট গাছের তলায় জমাদারের কাছারি। নদীর চরে গণ্ডা দশেক শকুনি এক দৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া আছে, কয়েকটা উড়িয়া আসিতেছে, গোটা দশ বার শিয়াল কুকুর জমা হইয়া গিয়াছে, চার ছ'টা কুকুর একটা পায়ের পাতার জন্য কামড়া কামড়ি লাগাইয়াছে, কিছু দূরে আর একটা পায়ের পাতা লইয়া সাতটা শকুনি টানাটানি করিতেছিল, একটা শিয়াল আসিয়া কাড়িয়া লইয়া গেল; শকুনিগুলা অল্প সরিয়া গিয়া ডানা মেলিয়া বসিয়া আছে। চার-জন হাড়ি নাকে কাপড় বাঁধিয়া ঠেঙ্গা কাঁধে ফেলিয়া শিয়াল শকুনি তাড়াইতেছে। জমাদার অনেক লোকের এজাহার কলমবন্দ করিয়া ফেলিয়াছেন।

দোকানী গোপী সাহু বুড়া এজাহার দিল,—আজ্ঞা আমার তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, আমি কি এ বয়সে মিথ্যা বলব? আজ একাদশী, দাঁতে তৃণটি কাটি নি, এই বিষ্ণু বৃক্ষের তলায় সত্য বলছি, আমি এ

মামলার কথা কিছু জানি না, ছয় মাস হল ব্যারামে ঘরে পড়ে আছি, দোকানে আসি নি।

মাঝি চান্দিআ বেহেরা এজাহার দিল, বৃষ্টি ও তুফান হওয়ায় কেহ নদী পার হয় নাই, সে চারদিন হইল নদীর ধারে আসে নাই। এইরূপ গ্রামের অনেক লোকের নিকট এজাহার নেওয়া হইল।

বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে, গ্রামে আর কেউ বাকি নাই, সকলের তদন্ত সারা হইয়াছে; মামলা কাল পর্যন্ত মুলতবি রাখা হইবে, না আজই খতম করা হইবে জমাদার ও বরকন্দাজ দুইজন বসিয়া পরামর্শ করিতেছেন এই সময়ে গাছের ডাল হইতে একটা শঙ্খচিল পুরীষ ত্যাগ করিয়া দেওয়ায় জমাদারের দাড়ির আধা-আধি শাদা হইয়া গেল। তোবা তোবা কহিয়া জমাদার উঠিয়া পড়িলেন। চিলদিগের প্রতি তাকাইয়া কম্‌বখ্‌ত্‌, বেঅকুফ, হারামজাদা বলিয়া ক্রোধভরে গালি দিতে লাগিলেন। চৌকিদাররাও গালি দিয়া চিলগুলিকে ঢিল মারিতে লাগিল। জমাদারের লম্বা দাড়ি পরিষ্কার করিতে তিন বদনা জল লাগিল।

জমাদার মামলা খতম করিতে বসিয়া লোকেদের বলিলেন, দেখ, এই লোক কে জানা নাই, বোধ হয় যাত্রী, এ খুন হয় নি, একে সাপে কেটেছে। গোপী সাহু দোকানী আগাইয়া আসিয়া সাক্ষ্য দিল—ধর্মাবতার, এখানে সাপের ভারী উপদ্রব, নদীর বানে কোথা হতে ভেসে এসে হাজার হাজার সাপ এখানে রয়েছে, সাপের ভয়ে গ্রাম ভেঙ্গে গেল; আমি কাল দোকানে এসেছিলাম, একটা লম্বা মেটে রঙের গোখুরা সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আমি ভয়ে পালালাম।

চৌকিদার মুটুরু মলিক বলিল, ধর্মাবতার, এখানে অনেক সাপ, আমি সেদিন হুজুরের কাছে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, এই গাছের তলায় পনেরটা গোখুরা সাপ শুয়েছিল, আমি দেখে পালালাম।

গত পরশু রাত্রে স্ত্রীলোকটা ঘরের মধ্যে শুইয়া থাকিবার সময় দুয়ারে একটা কেউটে সাপ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল বলিয়া মুগপুর মৌজার চৌকিদার বুধেই ধপট সিং সাক্ষ্য দিল।

জমাদার সকলের সাক্ষ্য কলমবন্দী করিয়া একটি পশ্চিমা ভিখারিনী যাত্রী গ্রামে ভিক্ষা করিয়া খাইতেছিল ও তাহাকে গত পরশু রাত্রে গোপাল-পুর মৌজায় সাপে কাটিয়াছে ও লাসের গায়ে সাপে কামড়াইবার চিহ্ন জাহির আছে এবং তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে অন্য কোনও সক্‌ (সন্দেহ) কিম্বা দাবি-দাওয়া নাই এই মর্মে এক রিপোর্ট কেন্দ্রাপাড়া থানার দারোগার নিকট পাঠাইয়া মামলা খতম করিলেন। দারোগা এবং মুনশীকে তাঁহার

উপঢৌকন সমেত রিপোর্টের পুলিন্দা থানায় পাঠানো হইল। জমাদারের হুকুম অনুসারে চারিজন হাড়ি লাসের গলায় দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিল। মাঝি চান্দিআ বেহেরা দেখিল লাসটা নদীতে ভাসিয়া যাইতে যাইতে যেখানে সেই পথিককে কুমীরে ধরিয়াছিল ঠিক সেই স্থানে তাহাকে একটা কুমীরে ধরিয়া লইয়া গেল।

জমাদার নৌকায় পার হইতে হইতে বরকন্দাজকে বলিলেন—দেখ এত বড় মামলাটাতে পুরা দুশও হল না। বরকন্দাজ বলিল, খোদা মালিক, যো হুকুম হুয়া।

গোপী সাহু সেই দিন হইতে আর দোকানে যায় না, কার্তিকের তিন দিন নাগাড় বৃষ্টিতে ঘর পড়িয়া গেল, পথও ধসিয়া গেল। চান্দিআ বেহেরা আধ ক্রোশ ভাটিতে হরিপুরের কাছে নৌকা লইয়া গিয়াছে। রাত তো রাত, দিনেও ভয়ে কেহ সেখানে যায় না। সেই বটগাছে নাকি একটা বড় পেত্নী বসিয়া ডাল দোলায়, দুপুর বেলা নদীর বালি উড়াইয়া খেলা করিতেও নাকি অনেকে দেখিয়াছে। গোপালপুর ঘাটের আর নাম নাই, লোকে বলে পেত্নীপদা।

২৫ ॥ মঙ্গরাজ বাড়ির হালচাল

'ছ'য় মাণ আঠ গণ্ঠ' কি? কথিত আছে পৃথিবীর বিখ্যাত মণি কোহিনূর যাহার কাছে থাকে সে নির্বংশ হয়। আলাউদ্দিন হইতে রণজিৎ সিংহ পর্যন্ত তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ; কিন্তু সেই মণি আমাদের পূজনীয়া মহামান্যা প্রত্যক্ষ লক্ষ্মীস্বরূপা শ্বেতদ্বীপবাসিনী ভারতেশ্বরীর* শিরোভূষণ হওয়া অবধি ইংলণ্ডের মহিমা দিন দিন বিশ্ব ব্যাপিয়াছে। অন্যের প্রাণনাশকারী বিষ দেবাদিদেব উমাপতির কণ্ঠস্থ হইয়া তাঁর মহাদেবত্ব প্রকাশ করিতেছে। সার কথা, উপযুক্ত দ্রব্য উপযুক্ত স্থানে ন্যস্ত হইলে বিপদের কারণ হয় না। অত বড় কথা ছাড়িয়া দাও, নেহাত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমাদের 'ছয় মাণ আঠ গুণ্ঠে'র কথাই ধর। লোকে বলে, গোবিন্দপুর গ্রামের এই 'ছয় মাণ আঠ গুণ্ঠ' নাবাল জমির মত সোনা-ফলানো জমি আর নাই, কিন্তু জমিটা নির্বংশে। বাঘসিংহ বংশটা ছারখার হইয়া গেল, শারিআ তো ধনে প্রাণে মরিল, মঙ্গরাজ বংশের কথা তো হাটে পড়িয়াছে। জমিটা লইবার ছয় মাস গেল না ছয় পক্ষও গেল না, কি পরিণাম হইল দেখ।

মঙ্গরাজ কটক যাইবার চতুর্থ দিন সকালে দেখা গেল তোশাখানার চার জায়গায় কেহ এক হাঁটু প্রমাণ গর্ত খুঁড়িয়াছে। সেইদিন সকাল হইতে গোবিন্দ ও চম্পাকে বাড়ির মধ্যে দেখা যাইতেছে না। সেই দুইজনকে আগে পিছে করিয়া পদ্মপুরে কটকের পথে লোকে যাইতে দেখিয়া গ্রামে আসিয়া বলিল। ছেলেরা বাপের ভয়ে তটস্থ হইয়া থাকিত, এখন তাহাদের পোয়াবারো হইয়াছে। বড় ছেলের আগে হইতেই কিছু পাগলামির ছিট, এখন দিনরাত গাঁজা টানিয়া টানিয়া পুরাদস্তুর পাগল হইয়াছেন. মেজ ও ছোট ছেলের নাক মুছিবারও ফুরসৎ নাই, মকর সংক্রান্তি মাথার উপরে, বুলবুলি ধরায় লাগিয়াছেন, দিনরাত ধান বিক্রি চলিয়াছে।

আজ গ্রামে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, মঙ্গরাজের ঘর বাড়ি নিলাম হইবে। বেলা দুই প্রহর, পুলিশের জমাদার, বরকন্দাজ, চৌকিদার এইরূপ আট দশ জন লোক মঙ্গরাজের দেউড়িতে উপস্থিত হইল। জজ সাহেব মঙ্গরাজকে এক হাজার টাকা জরিমানা করিয়াছেন, অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম

*মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

হইয়া টাকা উসুল হইবে। জমাদার ঘরে ঢুকিয়া জিনিষপত্র বহিয়া আনিয়া বাহিরে জমা করিতেছেন। পাখীর বাসায় সাপ ঢুকিলে পাখীরা বাসা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া যেমন অসহায় ভাবে চীৎকার করিতে থাকে তেমনি বাড়ির বউ-ঝিরা ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া বাড়ির পিছনে বাগানের মধ্যে আকুলি বিকুলি করিতেছে। ছেলেরা কেহ ঘরে নাই। বাড়ির সরকার কি বলিতে যাইতেছিল জমাদার চোখ রাঙাইয়া চাহিতে চুপ করিয়া গিয়া গালে হাত দিয়া বারান্দায় বসিয়া পড়িয়াছে। মুকুন্দা সকলের কথায় আজ্ঞা হাঁ আজ্ঞা হাঁ করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে।

বাহিরে মালপত্রগুলি নিলাম হইল। নিলাম তো নিলামই, মাত্র দুই বছর হইল জোতা হইতেছে এমন এক জোড়া বলদের দাম সাড়ে চার কি পাঁচ টাকা কে কবে শুনিয়াছিল? দুধেল গাইগুলি টাকা টাকা, দুই বছরের বকনার সহিত। প্রথমটা আপন গাঁয়ের লোক নিলাম ডাকিতে-ছিল না পরে দাম দেখিয়া এক একজন করিয়া ভাঙিয়া পড়িল। জমাদার তো নিলাম করিয়া টাকা লইয়া গেল, বাকী যে গাই-বলদগুলি ছিল এ ক্ষেত ও ক্ষেত, এ পথ ও পথ টো টো করিয়া বেড়াইতেছে, সামলাইবার কেহ নাই। বাঙগালী গোয়ালার গোঠে কতক গিয়াছে, কতকগুলি পথ ভুলিয়া অন্য অন্য গ্রামে গিয়া পড়িতেছে। মজুররা দুই বৎসরের বেতন পায় নাই, শুনা যায় আম বাগান, নারিকেল গাছ, গাই গরু হইতে তাহারা তাহাদের বকেয়া বেতন উসুল করিয়া লইতেছে।

কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হইয়াছে, অথচ আউশ ধান কাটা আরম্ভ হয় নাই, পাণ মজুরগুলা পলাইয়া গিয়াছে। খালি পালানো নহে, গরুর লেজ ধরিয়া চম্পট।

গাঁয়ের তিলের মত কথাটি হাটে আসিয়া তাল হয়, ইহা অতি সত্য বটে। চারিদিকে রটিয়াছে জজ সাহেব মঙগরাজের হাত হইতে তালুক ছাড়াইয়া লইয়া একজন উকিলকে দিয়াছেন। সেই উকিল আগামী মকর সংক্রান্তির দিন দুইশ' পাইক লইয়া পাঁচটা ঘোড়া দুইটা পালকিতে চড়িয়া গাঁ দখল করিতে আসিবে। প্রজারা শুনিয়া বলিল, "ঘোড়ারে, তোকে চোরে নেবে, না সেখানে দানাপানি না এখানে দানাপানি।" "যে রাজা হবে, আমরা তার প্রজা হব, নিজের হক কে ছাড়বে?" কিন্তু শত্রুপক্ষীয় লোকে ভারী খুশী। নিজের উসুল দূরে থাক, ভয়ে লজ্জায় মঙগরাজের পাইকেরা গাঁয়ে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। দুষ্ট লোকে পাইকদের দেখিলে 'গাছপালাকে উদ্দেশ করিয়া পরোক্ষে তাহাদিগকে দু' কথা শুনাইয়া দিতেছে।

২৬ ॥ বাবাজী ললিতাদাস

গতকাল হইতে গাঁয়ে ভারী একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। হাটে বাটে স্নানের ঘাটে হাঁড়িশালে ঢেঁকিশালে যেখানেই যাও সর্বত্র সেই এক কথা। কোথাও আস্তে আস্তে কথা চলিতেছে, কেহ চেঁচাইয়া বলিতেছে, কোনও বক্তা হাত নাড়িয়া মাথা নাড়িয়া গল্প ফাদিয়াছে, পাঁচজন বসিয়া মন দিয়া শুনিতেছে। কথাটা তো নানা রূপ ধারণ করিয়া ছড়াইতেছে, আমরা কেবল তাহার সারাংশ আপনাদিগকে শুনাইব।

মঙ্গরাজ কটক যাওয়ার সাতদিন হইতে পুরী ক্ষেত্র হইতে এক বাবাজী আসিয়া গোবিন্দপুরের ভাগবত-ঘরে* মঠ করিয়াছেন। বাবাজীর নাম ললিতাদাস; আধা বয়সী, শ্যামবর্ণ নাদুস নুদুস চেহারা, মাথাটি নেড়া, মাঝখানে তরমুজের বোঁটার ন্যায় টিকি, গলায় মোটা মোটা পাঁচনরী তুলসীর কণ্ঠি। বাবাজী অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া প্রাতঃস্নান সারিয়া নাকের মাঝখান হইতে মাথার চুল পর্যন্ত তিলক ও ডেড্‌লেটার অফিস হইতে ফিরিয়া আসা চিঠির মত সর্বাঙ্গে ছাপ মারিয়া হরি নাম শুনাইবার জন্য গ্রামে বাহির হন। পরিধানে কৌপীন, তার উপরে বহির্বাস, পিঠে নামাবলী, হাতে ঝুলি। বাবাজী গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলকে হরি নাম শুনান, সন্ধ্যার সময় খঞ্জনী বাজাইয়া কীর্তন গান, তার পরে চৈতন্য ভাগবত পাঠ। সন্ধ্যাবেলা ভাগবত-ঘরে জমাট বৈঠক হয়, গ্রামের বুড়া মত দশ বার জন তাঁতী ভেখ লইবে কথা হইয়াছে। বাবাজীটি ভারী নির্লোভ, কেহ কিছু দিলে 'হরে কেষ্ট, হরে কেষ্ট' বলেন। এমন সন্ন্যাসী কখনও কোথাও দেখা যায় না। আজ দুই দিন হইল কোথায় অন্তর্ধান হইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গরাজ বাড়ির মরুআর খোঁজ পড়িয়াছে। কেহ কেহ বলে সে বাবাজীর সহিত বৃন্দাবন ধামে চলিয়া গিয়াছে। বাস্তবিক সে যদি সাধু সহবাসে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গিয়া থাকে তবে আমরা তাহার চরিত্রের বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করার দ্বারা সাধু এবং সাধুীর নিন্দাজনিত মহাপাতক অর্জন করিতে অনিচ্ছুক। একটা কথা শোনা অবধি মনে বড় খটকা লাগিয়া আছে। মরুআ ছোট বউয়ের বড় বিশ্বাসী ছিল, সর্বদা তাঁর কাছে কাছে থাকিত। মরুআর সঙ্গে ছোট বউয়ের বাক্সের গহনাগুলিও আর পাওয়া যাইতেছে না। বাপের

* ভাগবত-ঘর॥ এইখানে ভাগবতাদি পুরাণ পাঠ ও অন্যান্য সভা হয়।

বাড়ি হইতে এবং শ্বশুর বাড়ি হইতে বিবাহের সময়ে মুখদেখা নগদ টাকা যাহা পাইয়াছিলেন তাহাও বাক্সেই ছিল। বাক্স খোলা পড়িয়া আছে, মাল কিছু নাই। সকলে সেই মালের সহিত মরুআর সম্পর্ক ধরিয়া কথা কহিতেছে। ছোট বউ তো একেবারে ডাক পাড়িতেছেন। সকলে ডাক পাড়িয়া চুপ করিল, মরুআকে খুঁজিতে কে যায়?

যে বাড়ির দুয়ারে দিন নাই রাত নাই লোকের যাওয়া আসার ভিড় লাগিয়া থাকিত, সেখানে আগাছায় ছাইয়া গিয়াছে।

বস্তুতঃ কয়েকটা মাসের মধ্যে সম্পত্তি গৌরব প্রতিপত্তি সব ছারখার হইয়া গেল।

"নির্জগাম, যদা লক্ষ্মীঃ
গজভুক্ত কপিত্থবৎ।"

২৭ ॥ অপূর্ব মিলন

মানুষ আপন কর্মফল ভোগ করে। তুমি ভাল বা মন্দ যেমন কাজ করিবে তাহার প্রতিফল অবশ্য তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। হে বুদ্ধিমান, তুমি অতি নির্জনে অতি সাবধানে কোনও কর্ম করিয়া মনে করিতেছ মানুষের দৃষ্টিপথের অন্তরালে রহিয়াছ। ভূমিতে একটি ক্ষুদ্র বীজ পুঁতিবার সময় কেহ দেখে না সত্য, কিন্তু তাহা হইতে জাত বৃক্ষের মনুষ্যদৃষ্টি অতিক্রম করিবার উপায় নাই। আবার দেখা যায় তুমি যে বৃক্ষ রোপণ করিলে তাহার ফল তোমাকে—কদাচিৎ বংশপরম্পরাক্রমে ভোগ করিতে হইবে। হে বলবান্, ধনবান্, গর্বিত, তুমি যাহাকে অতি সামান্য লোক বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ একদিন তাহার দ্বারা কি কার্য সাধিত হইতে পারে তুমি তাহা জান না। বঙ্গ বিহার ওড়িশার সুবাদার একটি সামান্য ফকিরের প্রতি অত্যাচার করিয়া রক্ষা পাইতে পারেন নাই। শিখ গুরু গোবিন্দ একজন সামান্য মুসলমানের উপকার করিয়া ঘোর বিপদে জীবন-সংকট হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। সে সকল বড় বড় ঐতিহাসিক কথা ছাড়িয়া দাও। বাঘসিংহের বাড়িতে চৌকিদার হইয়া থাকার জন্য রতনপুরের যে ডোমদিগকে আমাদের মঙ্গরাজ চক্রান্ত করিয়া জেল দেওয়াইয়াছিলেন ঘটনাচক্রে আজ তাঁহাকে ইহাদের হাতেই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইল।

রতনপুর মৌজার ডোমরা প্রথম দিন মঙ্গরাজকে জেলখানায় দেখিয়া 'স্যাঙাত আসিলেন' 'শ্বশুর আসিলেন' 'রাজাবাবু আসিলেন' ইত্যাদি বলিয়া হাসিয়া তামাশা করিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিল। কেহ ধনবান বড় লোক জেলে গেলে পুরানো সর্দার কয়েদীরা কিছু পাইবার আশায় তাঁহার প্রতি অত্যাচার করে। মঙ্গরাজ মহাশয় রতনপুরিয়াদিগের সহিত ঘানি টানিবার সময় তাঁর উপরে দুই একটা লাথি কিম্বা গুঁতো লাগিয়া যায়।

আমরা একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধে গোবরা জেনার কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসর কয়েদ হইয়া গিয়াছে।

দিন কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। চিরকাল সমানভাবে দিন রাত বহিয়া যাইতেছে। মঙ্গরাজ ঘানি টানিতেছেন বলিয়া যে দিন আটকাইয়া থাকিবে এমন কিছু নহে। লোকে বলে সুখের দিন ঘোড়ায় চড়িয়া ধায়, দুঃখের দিন হাতীতে বসিয়া যায়। তুমি যাহাই বল দিন তাহার কাজ

ভাল বোঝে। তাহার আট প্রহরের নিমেষমাত্রও এদিক ওদিক হইবার নহে। এক-দুই-তিন-চার দিন করিয়া মঙ্গরাজের মেয়াদ এক মাস দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে।

তিনি যে ঘরে শুইতেন সেটা মেরামত করিবার প্রয়োজন হওয়ায় তাঁকে অন্য একটি ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। জেলখানায় এক-একটি ঘরে আটটি করিয়া বেদীর ন্যায় মাটির ঢিবি বাঁধানো থাকে, রাত্রে কম্বল পাতিয়া তাহাতে আটজন কয়েদী শোয়। দৈবাৎ রতনপুর মৌজার ছয়জন ডোম, গোবরা জেনা এবং মঙ্গরাজ মহাশয় এই আটজন একটা ঘরে রহিলেন।

চারদিন আগে মঙ্গরাজের ভারী এক ফাঁড়া গিয়াছে। আজকাল কটকে দরগাবাজারে যে একটি পাগলখানা আছে তাহা পূর্বে ছিল না। পাগল-দিগকে জেলখানায় কয়েদ করিয়া রাখা হইত। মঙ্গরাজের কুঠরির নিকটে পাগলা গারদ। সেখানে এক ভয়ঙ্কর পাগল ছিল। সারারাত ঘুমায় না, 'আমার শারিআ', 'আমার ছয় মাণ আঠ গুণ্ঠ' বলিয়া নাচে, চীৎকার করে, ডাক পাড়ে, হাসে। সে মঙ্গরাজকে দেখিলেই কামড়াইতে ছোটে। বর-কন্দাজরা ধরিয়া রাখে। সেদিন হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া মঙ্গরাজের নাক কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া দিয়াছে।

আবার আজ জেলখানায় ভারী গোলমাল। দুইটা কয়েদী রোগে ভুগিতে-ছিল। তাহার একটা মর মর অবস্থায় ছিল, আজ মরিয়াছে। অন্যটিকে শুশ্রূষা করিয়া নেটিভ ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার পট্টি বাঁধিয়া দিতেছেন।

বেলা নয়টার সময় সাহেব ডাক্তার আসিয়া লাস ময়না করিলেন, রোগীর সর্বাঙ্গ পরীক্ষা করিলেন। জেল দারোগা রেজিস্টারি বহি দেখিয়া বলিলেন—

লাস—৯৭৭ নম্বর কয়েদী গোবরা জেনা।

রোগী—৯৫৭ নম্বর কয়েদী রামচন্দ্র মঙ্গরাজ। রোগীর সর্বাঙ্গ স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠিয়াছে, নাক ফাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছে, সময় সময় রক্তবমন হইতেছে। ডাক্তার সাহেব রোগের কারণ প্রহার বলিয়া স্থির করিলেন।

খুব তদন্ত হইল, হৈ চৈ হইল, কে মারিল স্থির হইল না। রোগীর কথা কহিবার শক্তি নাই, কেবল গত রাত্রিতে পাহারা বরকন্দাজ অর্ধরাত্রে দুমদাম ধুপ ধাপ শব্দ শুনিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দিল। ডোম ছ' জন সাক্ষ্য দিল, কয়েদী দুইজন পরস্পর মারামারি করিয়াছে।

তদন্ত শেষ হইল। ডাক্তার সাহেব হুকুম দিলেন—রোগীর বাঁচিবার সম্ভাবনা কম, তাহার আত্মীয়স্বজনেরা ইচ্ছা করিলে চিকিৎসার জন্য

বাড়িতে লইয়া যাইতে পারে। পুলিসের থানার মারফতে গোবিন্দপুরে সাহেবের হুকুম পৌঁছিল।

ছেলেরা ধানের গোলা প্রায় চাঁচিয়া পুঁছিয়া আনিয়াছে। তাহারা বাপকে চেনে। ফিরিয়া আসিলে কি রক্ষা আছে? কোন্ বুদ্ধিমান্ লোক জানিয়া শুনিয়া নিজের বিপদ ডাকিয়া আনে? 'আত্মানং সতত রক্ষেৎ' এই নীতিবাক্যটি সকলেই জানে।

বুড়া মজুর মুকুন্দা ব্যস্তসমস্ত হইয়া দুইটা এঁড়ে বাছুর, চার ছয়টা পালানের সাজ বিক্রি করিয়া দিয়া একটা ডুলি লইয়া তাড়াহুড়া করিয়া কটকে ছুটিল।

উপসংহার

তিন মাস আগে তুলসী মঞ্চের কাছে মাঠাকরুনকে যে ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল, ঠিক সেই স্থানে ঠিক সেইরূপ উত্তরে মাথা করিয়া একখানা মলিন কাঁথায় মঙ্গরাজ পড়িয়া আছেন—হাত পা নড়ে না, চোখের পাতা পড়ে না, এক দৃষ্টে উপর দিকে চাহিয়া আছেন। শিবা চামার, কার্তিক নায়ক দুই বৈদ্য লাগিয়াছিল, কাল রাত হইতে জবাব দিয়া গিয়াছে, গোপীআ তাঁতী হাত লাগাইয়াছে। গোপীআ তাঁতী ওরফে গোপী কবিরাজ একজন ডাকসাইটে জবরদস্ত বৈদ্য, চারখানা গ্রামের লোক তাহাকে জানে। দিনে রাতে তাহার মরিবার ফুরসত নাই। সকালে উঠিয়া কোমরে চাদর বাঁধিয়া কাঁধে লাল গামছা ফেলিয়া বগলে ঔষধের থলি ঝুলাইয়া, মাথাবাঁকা গেঁটে বাঁশের লাঠিগাছটি হাতে করিয়া রোগী খুঁজিতে বাহির হয়। থলির ভিতর বাহাত্তর নিদান রোগের ঔষধের বটিকা আলাদা আলাদা তসরের কাপড়ে সযত্নে বাঁধা আছে। গোপীর খুড়া একজন নামজাদা বৈদ্য ছিলেন, তাঁহার ঔষধ রোগীর দেহে আশু ফলপ্রদ। তাঁহার হাতের তৈয়ারী বটিকা গোপী আজ পর্যন্ত সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

গোপী রোগীর বিছানার ডান পাশে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়ি টিপিলেন, উপর পানে চাহিয়া চোখ বুজিয়া মুখ বিকৃত করিয়া রোগ অনুমান করিলেন। মুকুন্দা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। শুধাইল, কবিরাজ মশায়, কি দেখলেন? কবিরাজ গম্ভীরভাবে স্থির হইয়া বসিয়া বলিলেন—ইয়ে, কি বলে গিয়া 'কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িনীজনে কিং পুনর্দূর-সংস্থে'—অর্থাৎ কি না কণ্ঠে তো শ্লেষ্মা লাগিলে প্রাণ যায়, সে আবার দূরে চলে গেলে কি দশা হবে? তবে কি না আমি তো এদের মত হাতুড়ে কবিরাজ নই। দেখ, আমি রোগ গামছার খুঁটে বেঁধে নেব। কবিরাজ মহাশয় এই বলিয়া গামছার খুঁটে গেরো বাঁধিলেন।

মুকুন্দা জিজ্ঞাসা করিলেন—রোগীর দেহের এক একটা জায়গা ফুলেছে কেন? কবিরাজ—ইয়ে বলে 'স্বর্ণাদিষ্টগুণং শোথং'—কি না শ্লেষ্মা দোষের গুণে শোথ হয়। আচ্ছা, ভাবনা নেই, কস্তুরী পেটে পড়লে সব সেরে যাবে। 'কস্তুরী তিলক' খেতে হবে আর তিলক করে দিতে হবে। কবিরাজ মুকুন্দার কাছ হইতে নগদ বার আনা পয়সা লইয়া দেড়টি বটিকা কস্তুরী

থলি হইতে বাহির করিলেন—ইহার সঙ্গে অনুপান দরকার—কবিরাজ বলিলেন, শাস্ত্রে বলে 'মুস্তকং কটুকী রাত্রী—শুণ্ঠি পিপ্পলি মেবচ'। ইয়ে, বলে রাত্রে শুণ্ঠ পিপ্পলি বচ মুথার সঙ্গে কুটবে। মুকুন্দা শুধাইল—কতখানি করে এ সমস্ত জিনিস আনতে হবে? কবিরাজ—ইয়ে, বলে 'অনুপান বিশেষণ করোতি বিবিধান গুণান্।' অর্থাৎ কিনা অনুপান বিশেষ করিয়া অর্থাৎ বেশী করিয়া দিলে বিধা* অর্থাৎ কিল মারার মত গুণ হয়।

কবিরাজ রোগের ব্যাখ্যা এবং ওষুধের ব্যবস্থা করিতে করিতে রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, ক্রমশঃ নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে, দুই চোখের কোণ হইতে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িয়াছে। মঙ্গরাজ চারদিন হইল পড়িয়া আছেন। একদৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া পড়িয়া আছেন, কখনও একটু চোখ লাগিয়া আসিলে চমকিয়া উঠিয়া বলিতেছেন থ-মা-আ-গুঁ। স্বর ক্ষীণ, ক্রমেই ক্ষীণতর, কিছু বোঝা যাইতেছে না। একটু তন্দ্রা আসিলে দেখেন আকাশে এক ভয়ঙ্করী মূর্তি—বিশাল মুণ্ডের চুলগুলি আলুলায়িত, মুলার ন্যায় বড় বড় সাদা দাঁত, দুই তিন হাত লম্বা জিভ লক লক করিয়া তাহাকে গিলিতে আসিতেছে। মঙ্গরাজের মনে হয় তাঁতী পাড়ায় ভগিআ তাঁতীর ঘরের দাওয়ায় একটি স্ত্রীলোককে লাটাই ঘুরাইতে দেখিয়াছিলেন। সেই স্ত্রীমূর্তি ভয়ঙ্কর বিকট রূপ ধারণ করিয়া এইরূপ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই মূর্তি যেন বজ্রস্বরে বলিতেছে,—"আমার 'ছ মাণ আঠ গুণ্ঠ' জমি দে।" মঙ্গরাজ আঁতকাইয়া উঠিয়া বলেন থ-মা-আ-গুঁ। মঙ্গরাজের আর-একবার চোখ লাগিয়া আসিল। দেখিলেন একটা ভয়ঙ্কর নরকঙ্কাল দিগন্তরাল হইতে মুখ ব্যাদান করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য যেন একদৃষ্টে নীরবে চাহিয়া আছে। তাঁহার বেশ মনে হইল যাহার জমি কাড়িয়া নেওয়ায় অনাহারে শুকাইয়া শুকাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল এ সেই মূর্তি। আর দেখিলেন ভগিআর মত শত সহস্র ক্ষ্যাপা আকাশপথে ঘোর কালো মেঘের ভিতর হইতে বাহির হইতেছে, সকলের হাতে খড়্গ ও লৌহমুদ্গর। এক সঙ্গে সবগুলি মুদ্গর যেন তাঁহার মাথায় পড়িল। মঙ্গরাজ চীৎকার করিয়া পালাইতে গেলেন, দেহে শক্তি নাই, মুখ খুলিতেছে না। মঙ্গরাজ উপায়হীন হইয়া সেই অনাথশরণ পতিতপাবন ভগবানের পবিত্র নাম হৃদয় মধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন অনন্ত আকাশে সূর্যমণ্ডলের বহু ঊর্ধ্বে রত্নসিংহাসনে এক জ্যোতির্ময়ী শান্তিময়ী আশাপ্রদায়িণী স্ত্রীমূর্তি বিরাজিতা, পূর্ব পূর্ব

* বিধা॥ কিল।

পীড়ার সময়ে যে মূর্তি শয্যার পাশে বসিয়া মঙ্গরাজের গায়ে কোমল হস্ত বুলাইতেন বিমানচারিণী লাবণ্যময়ী মূর্তি সেই মূর্তিরই প্রতিচ্ছায়া—অঙ্গুলি সঙ্কেতে মঙ্গরাজকে নিজের পাশে ডাকিতেছেন। মঙ্গরাজের আত্মা সেই মূর্তিকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল। মঙ্গরাজের বাড়িতে শোর উঠিল। হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল।

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২০	বাতিল	রেরাত
১৭	৫	বংশেৎস্মিন্	বংশেহস্মিন্
৩৩	৫	বহ্নিমাণঃ	বহ্নিমান্
৪১	২৩	রাবনা	রাবণা
৪১	ফুটনোট	রাবনা	রাবণা